শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

২৫টি শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প
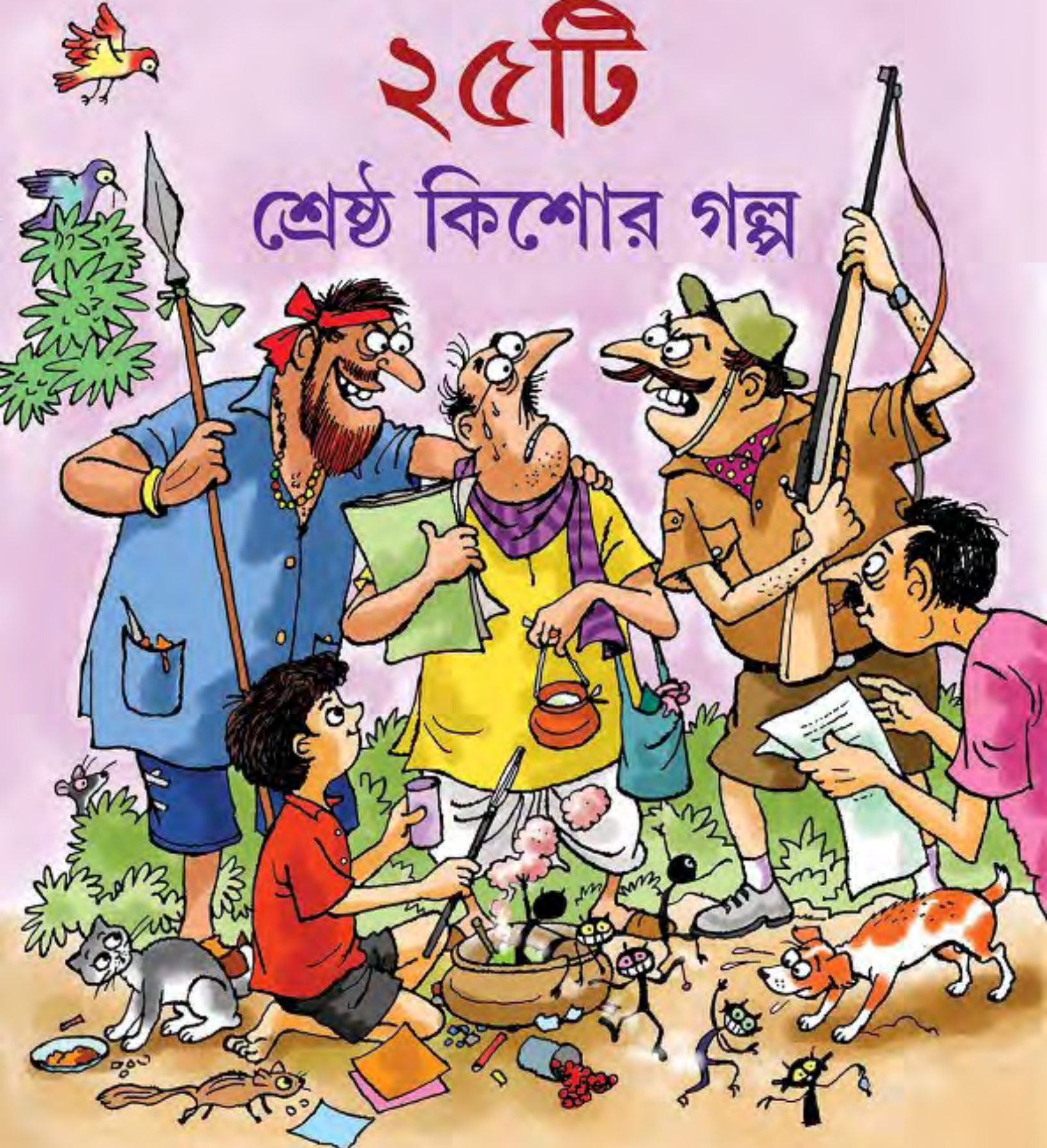
পা রু ল

২৫টি শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প

২৫টি শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পা রু ল

সূচি

বাঘের দুধ

নফরগঞ্জের রাস্তা

কবচ

রাজার হেঁচকি

'এই যে বলাইবাবু, নমস্কার! তা খবরটবর সব ভালো তো?'
'হ্যাঁ, তা খবর তেমন খারাপও কিছু নয়। বাজারে নতুন ফুলকপি উঠেছে, রাঙা মুলো পাওয়া যাচ্ছে, সরেস নলেনগুড়ও এসে গিয়েছে। টাটকা কইমাছের আমদানিও ভালো। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না।'
'আপনি কি নবকিশোর রায়কে চেনেন?'
'নবকিশোর! না মশাই, নবকিশোর নামে কাউকে তো মনে পড়ছে না।'
'তাহলে বটকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্যে?'
'উঁহু, বটকৃষ্ণ নামটা শোনা-শোনা হলেও চেনা-চেনা লাগছে না তো।'
'মহানন্দ তলাপাত্র নামের কাউকে কি চেনা ঠেকছে?'
'না মশাই, মহানন্দ নামটা শুনেছি বলেই মনে পড়ছে না।'
'মুশকিল কী জানেন বলাইবাবু, আপনি না-চিনলেও এঁরা সব আছেন কিন্তু। এই আপনার মতোই সকালে বাজার করছেন, দশটায় অফিসে যাচ্ছেন, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি খাচ্ছেন, লুঙি পরে রকে বসে আড্ডা দিচ্ছেন।'
'অ, তা হবে, কিন্তু এঁদের কাউকেই আমি চিনি না মশাই।'
'আজ্ঞে, তাই তো বলতে চাইছি বলাইবাবু, দুনিয়ার ক-টা লোককেই বা আপনি চেনেন? চেনা তো বড়ো সহজ কাজও নয়। লোকও যে হাজারে-বিজারে, লাখো-লাখো, কোটি-কোটি। কোন মহাপুরুষ যেন বলেছেন, লোক না-পোক। তা এত অচেনা লোকের মধ্যে এক-আধজনকে মাঝে মাঝে চেনা করে নিতে ইচ্ছে যায় না আপনার? এই ধরুন, নবকিশোরকে আপনি চেনেন না, কিন্তু নবকিশোরের ছেলে কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে ফস করে যদি আপনার মেয়ে টেঁপির বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে নবকিশোর কি আর আপনার অচেনা থাকবে?'
'টেঁপির বিয়ের কথা উঠছে কেন মশাই? টেঁপির তো মোটে এগারো বছর বয়স!'
'আহা, কথার কথা বলছি আর কী! কৃষ্ণকিশোরেরও মোটেই বিয়ের বয়স হয়নি, সবে সতেরোয় পড়েছে। তাই বলছিলুম অচেনা লোক বলে কি দূরে ঠেলে রাখা ভালো? কার সঙ্গে কখন কোন সূত্রে চেনাপরিচয় হয়ে যায় তার তো কোনো ঠিক নেই। এই যে আমি, গতকাল পর্যন্তও কি আমার সঙ্গে আপনার চেনা ছিল? আজ কেমন হুট করে চেনা হয়ে গেল বলুন তো!'
'না মশাই, চেনা এখনও হয়নি, আপনাকে আমি মোটেই চিনি না।'
'ওই তো আপনার দোষ বলাইবাবু! চিনবেন না বলে গোঁ ধরে থাকলে কি আর চেনা যায়? আমি হলুমগে গোবিন্দলাল।'
'অ। তা ভালো। পরিচয় পেয়ে বড়ো খুশি হলুম। আমি তাহলে আসি?'
'বিলক্ষণ। আসবেন বই কী। তা চলুন, আমিও ওইদিকেই যাব কিনা! যেতে-যেতে দুটো সুখ-দুঃখের কথাও বলা যাবে। তবে আমার আবার দুঃখের পাল্লাটাই ভারি কিনা!'
'দেখুন গোবিন্দবাবু, দুঃখটু:খ আমাদের সবারই আছে। এখন ওসব হাপরহাটি শোনার আমার সময় নেই। অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'
'তা তো বটেই। তবে কিনা আজ একটু দেরি হলেও তেমন ক্ষতি নেই। রোববারের অফিস তো!'

‘আজ রোববার বুঝি? একেবারেই খেয়াল ছিল না। অফিস না-থাকলেও আমার অনেক কাজ আছে গোবিন্দবাবু।’

‘সে আর বলতে! রোববার তো আপনার গেঞ্জি আর আণ্ডারওয়্যার কাচার দিন এ কে না-জানে? এ ছাড়া করালীবাবুর সঙ্গে জমিতে বেড়া দেওয়া নিয়ে বকেয়া ঝগড়াটাও মুলতুবি রয়েছে। রোববারে কিস্তির কাজিয়াটাও সারতে হবে। তারপর ধরুন বেলা এগারোটায় লক্ষ্মীকান্তবাবুর সঙ্গে একপাট্টি দাবা খেলা আছে। রোববারে যে আপনার দম ফেলার সময় থাকে না এও সবাই জানে কিনা!’

‘আপনি তো খুব ঘোড়েল লোক মশাই। আমার সম্পর্কে এত খবর পেলেন কোথায়? আপনি পুলিশের চরটর নন তো?’

‘ঘাবড়াবেন না বলাইবাবু। আমি আসলে একজন দুঃখী লোক। একটা খারাপ খবর দিতেই আপনার কাছে আসা।’

‘খারাপ খবর? কীরকম খারাপ খবর মশাই? কাটোয়ায় আমার নব্বই বছরের বুড়ি পিসি থাকেন, তা পিসি হঠাৎ মারাটারা যাননি তো? আমার রাঙামামার ক্যানসার হয়েছিল বলে একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম, তাঁর কিছু হলটল নাকি? হ্যাঁ মশাই, টাটা কোম্পানির শেয়ারের দর কি হঠাৎ পড়ে গিয়েছে? আমার চিরশত্রু কালোবরণ কি লটারি পেয়েছে? নাকি ট্যারাকেষ্ট জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে? সে বলেছিল বটে, জেল থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে নেবে। হ্যাঁ মশাই, বিষ্টুবাবু কি তাঁর দু-হাজার টাকা ধার আদায় করতে আসছেন? আমার নামে হুলিয়া জারি হয়নি তো? নাকি কেউ আমাকে মারার জন্য গুণ্ডাদের সুপারি দিয়েছে?’

‘না, মশাই না। খবরটা খারাপ হলেও আপনার ভয় নেই। কথাটা হল আমার চাকরিটা গিয়েছে।’

‘যাক বাবা, বাঁচা গেল! খারাপ খবরের কথা শুনলে আজকাল বড়ো বুক ধড়ফড় করে। তা আপনার চাকরি গেলে আমার কী যায়-আসে বলুন! আমি মশাই বড্ড ছা-পোষা লোক, সাহায্যটাহায্য চেয়ে লজ্জা দেবেন না!’

‘আরে না, আপনাকে লজ্জা দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। দুঃখের কথা কইলে বুকটা একটু ঠাণ্ডা হয়, এই যা।’

‘তা অবশ্য ঠিক। তা আপনি কোথায় চাকরি করতেন গোবিন্দবাবু?’

‘রামনগর রাজবাড়ির কথা জানেন কি?’

‘রামনগর রাজবাড়ি! না মশাই, ঠিক মনে পড়ছে না।’

‘আপনার জানা না-থাকলেও রামনগরের রাজবাড়ি খুবই বিখ্যাত।’

‘তা হতেই পারে। কত কিছুই তো আমাদের জানা নেই।’

‘অতি সত্যি কথা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই রাজবাড়িতে আমার একটি চাকরি হয়েছিল।’

‘রাজবাড়ির চাকরি। কিন্তু শুনতে পাই, আজকাল আর রাজাগজাদের দিন নেই। রাজবাড়িগুলো সব মিউজিয়াম বা সরকারি দপ্তর হয়ে গিয়েছে।’

‘তা গিয়েছে বটে। তবে দেশের সব চোর-ডাকাত যেমন জেলে যায় না, পুকুর বা নদীর সব মাছই যেমন ধরা পড়ে না, দেশলাইয়ের সব ক-টা কাঠিই যেমন জ্বালানো যায় না, তেমনই রাজবাড়ি-গুলোরও কয়েকটা এখনও টিকে আছে। রামনগরে শুধু রাজবাড়িই নেই, জরির পোশাকপরা মুকুট মাথায় বুড়ো রাজা আছেন, তাঁর তিন রানি, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেপাই-সান্ত্রী সব আছেন। সকালে রোজ দরবার বসে, সেখানে অপরাধীদের বিচারও হয়। সভাগায়ক, সভাকবি পর্যন্ত আছেন।’

‘বলেন কী মশাই? এ তো আষাঢ়ে গল্প! তা সেখানে যাওয়া যায়?’

‘খুব যাওয়া যায়। রাস্তাটা একটু প্যাঁচালো, এই যা!’

‘তা আপনি সেখানে কী চাকরি করতেন গোবিন্দবাবু?’

‘চাকরিটা বেশ গুরুতরই ছিল মশাই। সকালে শয্যাত্যাগের পর থেকে রাতে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত রাজামশাই ক-বার কাশলেন, ক-বার হাঁচি দিলেন, ক-বার হাই বা ঢেকুর তুললেন এবং ক-টা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তার হিসেব রাখা। কাশি হলে ক্রসচিহ্ন, হাঁচি হলে ঢ্যাড়া, ঢেকুর তুললে গোল্লা, হাই তুললে দাঁড়ি, আর দীর্ঘশ্বাস ফেললে ভাগচিহ্ন। রাত্রিবেলা বুড়ো রাজবৈদ্য সেগুলো যোগ দিয়ে হয়তো দেখলেন, রাজামশাই বাইশবার কেশেছেন, এগারোটা হাঁচি দিয়েছেন, এক-শো বত্রিশটা ঢেকুর আর তেরোটা হাই তুলেছেন, সেই বুঝে তিনি রাজার জন্য নানা ওষুধের ব্যবস্থা করতেন।’

‘এ তো ভারি মজার চাকরি মশাই।’

‘না মশাই, মোটেই মজার চাকরি নয়। রাজার হাঁচি-কাশির হিসেব রাখতে গিয়ে আমার নিজের নাওয়া-খাওয়া শিকেয় উঠল। সারাক্ষণ রাজামশাইকে নজরে-নজরে রাখতে হত। একটা হাঁচি-কাশির এদিক-ওদিক হলে বেতন কাটা যেত।’

‘তা রাজবাড়িতে বেতনটা কীরকম ছিল গোবিন্দবাবু?’

‘তা সেটা খুব মন্দ ছিল না। মাসে পাঁচ মোহর।’

‘মোহর? মানে সোনার মোহর?’

‘আজ্ঞে, সেখানে এখনও মোহরেরই চল কিনা! রাজামশাই তো সোনা-রুপো ছাড়া আর কোনো ধাতু ছুঁতেন না। তাঁর তলোয়ারের হাতলটাও রুপোবাঁধানো। গাড়ু, পিকদানি, থালা-গেলাস, সবই রুপোর!’

‘ওঃ, এ তো ভাবা যায় না মশাই! মাসে পাঁচ মোহর মানে তো পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা! রীতিমতো শাঁসালো চাকরি মশাই? তা সেটা খোয়ালেন কী করে?’

‘সেটাই তো দুঃখের কথা মশাই! একদিন রাতে রাজামশাই খেতে বসেছেন। কাশ্মীরি পোলাওয়ের সঙ্গে মাছের নবরত্ন কালিয়া, মোগলাই দমপুক্ত, মাংস, মুড়িঘণ্ট, মুর্গমসল্লম, চিংড়ির মালাইকারি, আলুবখরার চাটনি, নলেনগুড়ের পায়েস, রাবড়ি, রাঘবশাহি আর সরভাজা।’

‘এ যে এলাহি ব্যবস্থা মশাই! বলি রাজা-গজাদের কি ব্লাডসুগার, কোলেস্টেরল, হার্ট ডিজিজের ভয় নেই, নিদেন গ্যাস, অম্বল অথবা ডিসপেপসিয়া তো হতেই হবে!’

‘আপনার-আমার মতো চুনোপুঁটি তো নন, সাড়ে ছ-ফুট লম্বা, ইয়া বুকের ছাতি, পেল্লায় ভুঁড়ি, থামের মতো পা, মুগুরের মতো হাত।’

‘বুঝেছি, বুঝেছি। তারপর কী হল বলুন?’

‘হ্যাঁ, সেই দুঃখের কথাটাই বলি। মাংস চিবোতে গিয়ে রাজামশাই একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছিলেন। সে এমন ঝাল লঙ্কা যে, রাজামশাই একেবারে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। ঝালের চোটে হেঁচকি উঠে গেল। আর সে কী হেঁচকি মশাই। হেঁচকির চোটে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। রাজবৈদ্য ছুটে এলেন, মন্ত্রী এলেন, সেনাপতি এলেন, বিদূষক এলেন। ঘটি-ঘটি জল খাওয়ানো হল, নানা মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা হল, বিদূষক নানা রসিকতা করলেন, কিছুতেই কিছু হয় না। রাজামশাই হিচিক-হিচিক করে কেবল হেঁচকি তুলে যাচ্ছেন। তখন আমি বললাম, ‘মন্ত্রীমশাই আমি একটু চেষ্টা করে দেখব?’ মন্ত্রী বললেন, ‘অবশ্য-অবশ্য। রাজাকে আরোগ্য করলে পারিশ্রমিক পাবে।’ আমি দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গিয়ে কী করলাম জানেন? রাজার গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে দিলাম!’

সারাক্ষণ রাজামশাইকে নজরে-নজরে রাখতে হত...

‘বলেন কী মশাই! এঃ হে:, এটা খুব ভুল করলেন। রাজার গালে চড় মারলে কি কারও চাকরি থাকে?’
‘থাকে। আমারটা অন্তত ছিল। কারণ, সামান্য একজন নফরের হাতে আচমকা চড় খেয়ে রাজা এমন চমকে গেলেন যে, তাঁর হেঁচকি সেরে গেল। গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, ‘এই ছোকরা কে?’ মন্ত্রী বললেন, ‘মহারাজ, এ আপনার হাঁচি-কাশির হিসেবরক্ষক।’ রাজা থমথমে মুখে একটা ‘হুঁ’ দিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন। হেঁচকি সেরে যাওয়ায় আমি একথালা রুপোর টাকা বকশিস পেলাম। কোম্পানির আমলের অ্যান্টিক জিনিস।’
‘তাহলে চাকরি গেল কীসে?’
‘পরদিন আমাকে বরখাস্ত করে যে চিঠিটা দেওয়া হল, তাতে লেখা ছিল, ‘রাজা ক-টা হেঁচকি তুলেছিলেন তার হিসেব রাখনি বলে তোমাকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।’
‘এ তো বড়ো অন্যায় মশাই। হেঁচকির হিসেব রাখবার তো কথা ছিল না আপনার?’
‘সেই দুঃখের কথাই তো বলতে এত দূর আসা মশাই! তা বলাইবাবু, আঠারো-শো পঞ্চান্ন সালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই রুপোর টাকাগুলোর কীরকম দাম হবে বলতে পারেন? ভাবছি, কয়েকটা বেচে দেব। যদুস্বর্ণকার পাঁচশো করে দিতে চাইছে। খুব ঠকা হবে কি? এই যে দেখুন না!’
‘আহা, হাটে-বাজারে এমন জিনিস বেচবার দরকার কী আপনার? এই দরেই আমি না-হয় সব ক-টা কিনে নিচ্ছি।’
‘নেবেন? তা নিন। চেনা মানুষের কাছে দু-পাঁচশো টাকা ঠকেও সুখ।’
‘তা তো বটেই, তা তো বটেই!’

বড়ো চোর ছোটো চোর

হরেকেষ্ট বোষ্টমের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকতে যাবে এমন সময় শীতল সাধুখাঁর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি। নবু দাস কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'শীতলদাদা যে!'
শীতল একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'দিনকাল কী পড়ল রে নবু, মগজ পাকল না, হাত মকশো হল না, গুরুবরণ হয়নি, দুধের ছোকরারা সব লাইনে নেমে পড়ল! ছি ছি! বিদ্যেটার উপর ঘেন্না ধরে গেল রে!'
শীতল দাস মান্যগণ্য লোক। লাইনে তার খুব নামডাক। বয়সেও বড়ো। তবু কথাগুলো শুনে নবুর ভারি আঁতে লাগল। বলল, 'দ্যাখো শীতলদাদা, আমাদেরও ঘরসংসার আছে, আমাদেরও পেট চালাতে হয়। একজন লুটেপুটে খাবে, আর আমরা আঙুল চুষব, এ তো নিয়ম নয়। আর মগজ পাকার কথা বলছ? মগজ কি আর ঘরে বসে থাকলে পাকবে? কাজে নামলেই মগজ খোলে। আর হাত পাকানোর কথা যদি বলো, তাহলে আমিও বলি, গেল হপ্তায় কি আমি বিদ্যেধর মন্ডলের লোহার সিন্দুক ভাঙিনি?'
শীতল কঠিন হাসি হেসে বলল, 'তা ভেঙেছিস! তবে পেয়েছিলি তো লবডঙ্কা! সিন্দুকের জিনিস সেদিনই বিদ্যেধর সব সরিয়ে ফেলেছিল। তোর বরাতে জুটেছিল এক বাণ্ডিল দস্তাবেজ, এক পুঁটুলি তামার পয়সা আর পঁচিশটি টাকা।'
নবু বলল, 'সেটা বড়ো কথা নয় শীতলদা। সিন্দুক যে ভেঙেছিলাম, সেটা তো স্বীকার করবে?'
এইভাবে দুজনের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল। তবে কোনো চেঁচামেচি নেই, ঝগড়া হচ্ছিল ফিসফিস করে, যাতে গেরস্তর ঘুম না-ভেঙে যায়। ফিসফিস করে ঝগড়া করা সোজা কথা নয়। এলেম লাগে।
শীতল বলল, 'দ্যাখ নবু, বড়োদের মুখে-মুখে যে কথা বলতে নেই, এই শিক্ষেটেও তোর হয়নি দেখছি। চোর-ডাকাত যা-ই হোস, মানীর মানটা তো দিবি! যাকগে, এখন তুই কেটে পড়। সামনের ফাল্গুনে আমার ছোটোমেয়ের বিয়ে। পাত্রপক্ষ ছ-হাজার টাকা পণ চেয়েছে। তার উপর সোনাদানা। বিয়ের খরচখরচা তো বড়ো কম নেই! তুই বরং শিবু হালুইয়ের বাড়িতে গিয়ে কাজ সেরে আয়। সকালে গোরু কিনতে প্রতাপপুরের গোহাটায় যাবে বলে শিবু সাত হাজার টাকা জোগাড় করে রেখেছে। খাটের নীচে মেটে হাঁড়িতে আছে। যা, গিয়ে হাসিল করে আয়।'
প্রেস্টিজে লাগলেও নবু আর কথা বাড়ায়নি। শীতলদাকে চটিয়ে লাভ নেই। বুড়ো চোরদের একটা জোট আছে। সে নতুন লাইনে নেমেছে, ট্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করলে, বিপদ হতে কতক্ষণ? বুড়ো চোরদের সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু এটা মানে যে, শীতল সাধুখাঁ, বিরিঞ্চি মন্ডল, বিরু গায়েন, হরিপদ কীর্তনীয়ার মতো ওস্তাদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। ওদের দোষ একটাই। নবুকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।
একটু দাঁড়িয়ে শীতল সাধুখাঁর হাতের কাজ আর কৌশলটা দেখার ইচ্ছে ছিল নবুর। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে বলে আর দাঁড়ায়নি।
মুশকিলটা হল, শিবু হালুইয়ের বাড়িতে ঢুকতে যেতেই, শিবুর মেজোখুড়ো যে একটু মাথাপাগলা লোক, এটা তার খেয়াল ছিল না। লোকটার দোষ হল, দাওয়ায় বসে সারারাত বকবক করে। লোকে বলে, পবনখুড়ো নাকি ভূতপ্রেতের সঙ্গে কথা কয়।
দাওয়ার দিকটায় সুবিধে নেই দেখে, নবু পিছন দিকটায় কচুবন পেরিয়ে গিয়ে জানলা ফাঁক করল বটে, কিন্তু কাজটা মোলায়েম হল না।

দু-বার দুটো খটাং আর মচাৎ শব্দ করে ফেলল। শীতল সাধুখাঁ ভুল বলেনি। এখনও তার সত্যি হাত মকশো হয়নি, গুরুমারা বিদ্যেও নেই। তবে পাকা মাথা হলে ভালো করে সুলুকসন্ধান আর আপৎকালের ফন্দিফিকির জেনে-বুঝে আসত। বিপদটা হল, ওই শব্দে সামনের দাওয়ায় পবনখুড়োর বকবকানি বন্ধ হয়ে গেল। আর ঘরের ভিতর থেকে শিবু হালুই ঘুমজড়ানো গলায় একটা হাঁক মারল, 'বলি ও মেজোখুড়ো, কথা কইছ না যে বড়ো! তোমার কথা বন্ধ হলে যে আমার ঘুমের অসুবিধে হয়।'

পবনখুড়ো বলল, 'এই একটু জল খেলুম বাপ। কথা তো সেলাই করতে হয় কিনা, তাই গলাটা শুকিয়ে যায়। টেনে ঘুম দে বাপু। কথা আর থামাচ্ছি না।'

পবনখুড়ো ফের বকবক শুরু করল। শিবু হালুইয়েরও নাক ডাকতে লাগল। নবু ডিং মেরে জানলা গলিয়ে ঘরের ভিতর সেঁধিয়ে গেল। কিন্তু খাটের নীচে নজর করে বড্ড দমে গেল সে। মেটে হাঁড়ির যেন হাট বসে গিয়েছে। গিজগিজ করছে মেটে হাঁড়ি। এর কোনটায় হালুইয়ের পো-র সাত হাজার টাকা আছে, তা কে জানে? প্রথম হাঁড়ির মুখ থেকে মালসা সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখল, গলা অবধি ধান। পরেরটায় চিটেগুড়। তার পরেরটায় তিসির তেল। কিন্তু হাল ছাড়লে তো হবে না। পরের হাঁড়িটা হাতড়ে দেখে নবু বুঝল, জায়গাটা ফাঁকা। কিন্তু হাঁড়ি রাখার বিঁড়েটা পড়ে আছে। অর্থাৎ চার নম্বর হাঁড়িটা যথাস্থানে নেই। তাহলে কি হাঁড়ি নিয়ে কেউ হাওয়া হয়েছে? গুটিদশেক হাঁড়ি তল্লাশের পর হাল ছাড়তে হল। কারণ, পবনখুড়োর বকবকানি থেমেছে এবং শিবু হালুইয়ের ঘুমও ভেঙেছে। সে হাঁক দিল, 'ও খুড়ো। ফের চুপ মেরে গেলে কেন?'

'চুপ কি আর সাধে মারি বাপ? তোর ঘরে যে ইঁদুর ঢুকেছে। বেজায় কুটুর-কুটুর শব্দ শুনছি। বলি, টাকাগুলো যদি কেটে রেখে যায়, তাহলে কাল সকালে কী দিয়ে গোরু কিনবি বাপু?'

'তাই তো!' বলে শিবু ধড়মড় করে উঠে পড়ল। নবু লহমায় জানলা গলে বাইরে লাফ মেরে পড়ল। পড়েই ছুটতে যাবে, এমন সময় জানালা গলে আর একটা লোকও লাফিয়ে নেমে এসে ক্যাঁক করে তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আহাম্মক কোথাকার! আর একটু হলেই যে কাজটা কাঁচিয়ে দিয়েছিলি রে হারামজাদা!'

লোকটাকে চিনতে পেরে নবু নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। শত্রুপক্ষের লোক নয়। এ হল নিবারণ সরকার। তা নিবারণদাদারও হাতযশ আছে। নিবারণদাদার বউ রিকশা করে বাজারে যায়। তার খোকাখুকিরা প্রাইভেট মাস্টারের কাছে পড়ে। বাড়িতে টিউবওয়েল আছে। দোহাত্তা কামায়।

নবু হাত কচলে দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'পাকা খবর পেয়েই ঢুকেছিলাম। তবে ফসকে গেল!'

নিবারণ অবাক হয়ে বলল, 'কীসের পাকা খবর রে? সেই গোরু কেনার সাত হাজার টাকা নাকি? সে তো আমি কখন গস্ত করে বসে আছি। সাত হাজার তো এখন আমার ট্যাঁকে। একটা হাঁড়িতে খানিক আমসত্ত্ব পেয়ে গেলাম বলে এই দেরি। ও জিনিস তো আর হালুমহুলুম করে খাওয়া যায় না। চিবিয়ে রসস্থ করে খেতে হয়। তা তোর জ্বালায় কি আর শান্তিতে বসে খেতে পারলুম!'

নবু লজ্জায় নতমুখ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

নিবারণ বলল, 'ওরে, মন খারাপ করিস না। রাত কাবার হতে এখনও মেলা দেরি। নন্দরামের ছেলের বিয়ে গিয়েছে পরশুদিন। শুনেছি পণের নগদ টাকা নন্দরামের বালিশের তলায় আছে, তা কম হবে না, হাজার দশেক তো বটেই। বেশিও হতে পারে। দ্যাখ চেষ্টা করে।'

নবু প্রমাদ গুনল। একসময় নবু নন্দরামের বাড়িতে মুনিষ খাটত। হাড়ভাঙা মেহনত করে মাসকাবারে তিরিশটি টাকামাত্র জুটত। তার ওপর নন্দরাম ভারি রাগী মানুষ, রেগে গেলে হাতের কাছে যা পাবে তাই ছুড়ে মারবে। গোরু হারিয়ে যাওয়ায় নবুর ওপর রেগে গিয়ে তার দিকেও ছুড়ে মেরেছিল বটে, তবে তখন নন্দরামের জলখাবারের সময় বলে হাতে ছিল একটা লুচিতে জড়ানো রসগোল্লা। তাই বরাতজোরে নবু বেঁচে যায়। আর সেই প্রথম রসগোল্লা দিয়ে লুচি খেতে কেমন লাগে তা টের পেয়েছিল। স্বাদ এখনও মুখে লেগে

আছে। সুবিধে শুধু এইটুকু যে, নন্দরামের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা তাকে খুব চেনে। আর বাড়ির সুলুকসন্ধানও নবুর জানা।

...'পাকা খবর পেয়েই ঢুকেছিলাম। তবে ফসকে গেল !'...

দেয়াল টপকে বাগানে ঢোকা জলের মতো সহজেই হয়ে গেল। কুকুরটা তেড়ে আসতেই নবু 'আমি রে, আমি' বলে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সেটা লেজ নেড়ে তার হাত-পা চেটে দিতে লাগল। সাফাইয়ের লোক ঢোকার ছোটো দরজাটার ছিটকিনি বরাবরই নড়বড়ে ছিল। বাইরে থেকে সেটা খুলে দেখতে কোনো মেহনতের দরকার হল না। গ্রিলের তালাটা মটকে দোতলায় উঠে যাওয়া অব্দি গা মোটে ঘামলই না নবুর। তবে তার তো কপালটা বিশেষ ভালো নয়, শেষ রক্ষে হলে হয়!

মুখখানা গামছায় ভালো করে জড়িয়ে নিল নবু। তারপর নন্দরামের শোয়ার ঘরের দরজাটায় হাত লাগাল। পাকা হাত হলে কোনো সমস্যাই নয়। কিন্তু মুশকিল হল, নবুর হাত এখনও নিতান্তই কাঁচা। শিক ঢুকিয়ে ভিতরের ছিটকিনি খুলবার কসরত করার সময় একটা ঢপ এবং একটা ঠং শব্দ সে সামাল দিতে পারল না। আর কপালের এমনই ফের যে, দরজার পাল্লাটা খুলতে যেতেই কবজায় এমন বিকট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হল যে, তাতে পাথরেরও ঘুম ভেঙে যায়।

আর হলও তাই। কাঁচা ঘুম ভেঙে নন্দবাবু উঠে বসলেন। গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'কে রে? কার এত সাহস? কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে, এই অসময়ে আমাকে বিরক্ত করিস?'

নবু বুঝল, এই মওকাটাও গেল। শীতলদাদা যা বলেছিল তা হাড়েহাড়ে সত্যি। সে এখনও দুধের শিশু। বারবার তিনবার কাজ ফসকে যাওয়ায় মাথাটাও যেন কেমনধারা হয়ে গেল নবুর। সে হঠাৎ বলে বসল, 'কাজের সময় অত চ্যাঁচামেচি করবেন না তো মশাই। ওতে ভারি অসুবিধে হয়।'

একথা শুনে নন্দরাম এমন হতবাক হয়ে গেল যে, প্রথমটায় মুখে বাক্য সরল না। তারপরই হঠাৎ 'তবে রে,' বলে একটা হুংকার ছেড়ে উঠে হাতের কাছে যা ছিল তাই তুলে ছুড়ে মারল নবুর দিকে। বরাবরই নন্দরামের হাতের টিপ খুবই ভালো। লুচিতে জড়ানো রসগোল্লাটাও নবুর কপালে এসে লেগেছিল, এটাও লাগল। নবু দু-হাতে কপাল চেপে ধরে 'আঁক' শব্দ করে বসে পড়ল বটে, কিন্তু বসে পড়েই বুঝতে পারল, তার হাতের কোষে এক বাণ্ডিল নোট।

ধুতির কষি আঁটতে-আঁটতে নন্দরাম খাট থেকে নামবার আগেই অবশ্য নবু একলাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে, বাগান পেরিয়ে, দেয়াল ডিঙিয়ে হাওয়া।

পরদিন কালুচরণের দোকানে ঢুকেই নবু টের পেল, বুড়ো চোরেরা তাকে আড়ে-আড়ে দেখছে। তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবটা আর যেন নেই বলেই মনে হচ্ছে। শীতল সাধুখাঁর চোখে একটু শ্রদ্ধার ভাবও যেন দেখতে পাচ্ছিল নবু। তা সে যাই হোক, নবু বেশ বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করেই বসে রইল।

দুই সেরি বাবা

ভুবন মানুষটা ভালো, কিন্তু তার কপাল ভালো নয়। কপালের ফেরে তার মা বসন্তকুমারী অতিশয় রগচটা মহিলা। মায়ের দাপটে আর গলাবাজির চোটে পাড়াপ্রতিবেশীরা কেউ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। আবার কপালের দোষে ভুবনের বউ নয়নতারাও হল সাংঘাতিক দজ্জাল।

নয়নতারাকে পছন্দ করে ভুবনের বউ করে এনেছিলেন মা বসন্তকুমারী। এখন শাশুড়ি-বউয়ে সকাল থেকে রাত ইস্তক রোজ এমন কুরুক্ষেত্র হয় যে, কহতব্য নয়। ঝগড়ার চোটে বাড়ির পোষা বেড়ালটা বিদায় নিল। পোষা নেড়ি কুকুরটাও মনের দুঃখে করালীবাবুর বাড়িতে গিয়ে জুটেছে। ডাকলেও আসে না। কাকপক্ষীরাও আনাগোনা বন্ধ করেছে। কাঙাল ভিখিরিরা অবধি এ-বাড়ির ছায়া মাড়ায় না।

ভুবনেরও মাঝে মাঝে সন্নিসি হওয়ার ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু ঠিক সাহস পায় না। সন্নিসি হলে লেংটি পরে থাকতে হবে, ভিক্ষে করে খেতে হবে। সাধনভজনের হ্যাপাও তো কম নয়। মা আর বউয়ের ঝাগড়ার চোটে অনেকদিন বাড়িতে রান্নাই হয় না। ভুবন না-খেয়েই দোকানে গিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে। দোকান তার ভালো চলে, আয়ও কম হয় না। তবে মনে সুখ নেই।

আজ ভোররাত থেকেই বসন্তকুমারী আর নয়নতারায় ঝগড়া লেগেছে। ভুবন বাড়িতে টিকতে না-পেরে সাতসকালেই এসে দোকান খুলে বসেছে। সন্নিসি হবে না গলায় দড়ি দেবে সে-কথাই বসে বসে ভাবছে। এত সকালে কর্মচারীরা আসে না, খদ্দেরও জোটে না। তাই নিরিবিলিতে বসে সুখরামের দোকান থেকে আনানো ভাঁড়ের গরম চা খেতে খেতে নিবিষ্ট মনে ভুবন ভাবছিল, সন্নিসি না গলায় দড়ি?

এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'ব্রাহ্মণভোজন।'

ভুবন অবাক হয়ে দেখল, একজন আধবুড়ো, দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক সামনে দাঁড়িয়ে। পরনে গেরুয়া রঙের একটা জোব্বামতো। মাথায় ঝুঁটি। সাধু-বৈরাগী হতে পারে। ফকির-দরবেশ কী আউলবাউল হওয়াও বিচিত্র নয়।

ভুবন বলল, 'আপনি কে?'

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, 'সন্নিসি হওয়া বা গলায় দড়ি দেওয়ার চাইতে ব্রাহ্মণভোজন করানো অনেক ভালো।'

ভুবন তাড়াতাড়ি উঠে লোকটার পায়ের ধুলো নিয়ে গদগদ হয়ে বলল, 'আপনি কি অন্তর্যামী?'

লোকটা খ্যাঁক করে উঠে বলল, 'অন্তর্যামী হওয়াটা কি খুব সুখের ব্যাপার বলে ভেবেছ নাকি হে বাপু? দিনরাত মানুষের মনের মধ্যে যত অকথা-কুকথা বুড়বুড়ি কাটছে সেগুলো কান দিয়ে ভেতরে এসে সেঁধোচ্ছে, সেটা কি ভালো হচ্ছে রে বাপু? দুটো কান অপবিত্র হচ্ছে রোজ। গঙ্গাজল দিয়ে রোজ পরিষ্কার করতে হয়। নাঙ্গাবাবা যে কী বিভূতিই দিলেন, এখন হয়েছে জ্বালা।'

ভুবন বলল, 'আপনি কে ?'...

ভুবন হেঁ: হেঁ: করে বলল, 'আজ্ঞে, পাপীতাপীদের জন্য না-হয় একটু কষ্ট করলেনই মহারাজ।'
'থাক, থাক, আর দাঁত বের করে বিনয় দেখাতে হবে না। বলি, খাঁটি সরষের তেল আছে?'
ভুবন হাতজোড় করে বলল, 'আছে বাবা, আছে।'
'তাই এক পলা বের করো তো বাপু। গায়ে খড়ি উঠছে। তা খড়ি ওঠারই বা দোষ কী? কৈলাস থেকে হেঁটে আসছি, চারদিন স্নান নেই।'
বলেই জোব্বাটা খুলে ফেলল লোকটা। আদুর গা হয়ে একটা টুল টেনে বসে বলল, 'বেশ ডলাইমলাই করে তেলটা মেখে দাও তো হে বাপু।'
ভুবন যেন বর্তে গেল। খুব যত্ন করে তেল মাখতে মাখতে বলল, 'তা বাবা, আপনার শ্রীনামটি কি শুনতে পাব না?'
'তা পাবে না কেন? নাম তো পাঁচজনকে বলার জন্যই। তবে এ হল সাধনমার্গের নাম। আমাকে সবাই আদর করে 'দু-সেরি বাবা' বলে ডাকে। সকাল-বিকেল দু-সের করে খাঁটি গোরুর দুধ খাওয়ার অভ্যাস কিনা।'
চোখ বড়ো-বড়ো করে ভুবন বলল, 'এক-এক বারে?'
'ওরে বাপু, দুধ কি আর আমি খাই? সাধনভজনে আত্মার যে মেহনত হয়, তাতে দু-সের দুধ তো নস্যি। ওটা আত্মাই টেনে নেয়। ওরে বাপু, নতুন গামছা আছে?'
'এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।'
'ওই সঙ্গে একজোড়া নতুন ধুতি আর দু-খানা ভালো গেঞ্জিও আনিয়ে রাখো। আর আমি পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে-আসতে যেন দু-সের দুধ তৈরি থাকে। দুপুরে ব্রাহ্মণভোজনে কী-কী লাগবে তা এসে বলছি।'
ভুবন খুব কাঁচুমাঁচু হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ব্রাহ্মণসেবা করা তো ভাগ্যের ব্যাপার বাবা, কিন্তু আমার যে বাড়িতে বড়ো অশান্তি।'
হা: হা: করে হেসে দু-সেরি বাবা বলে, 'সে কি আর জানি নারে মূর্খ! তোর জন্যই তো কৈলাস থেকে এত দূর কষ্ট করে আসতে হল। তোর দুঃখে স্বয়ং শিবের সিংহাসন নড়ে গেছে। বাবা শিবই তো আমাকে ডেকে বললেন, 'যা তো দু-সেরি, গিয়ে একটু দেখে আয়, ছেলেটা এত কষ্ট পাচ্ছে কেন?'
ভুবন গদগদ হয়ে বলল, 'বটে বাবা। স্বয়ং শিব পাঠিয়েছেন আপনাকে?'
'তবে আর বলছি কী রে ব্যাটা! যা, দুধের জোগাড় দেখরে।'
দু-সেরি বাবা স্নান করে এসে কাচি ধুতি পরে দু-সের দুধ শেষ করে বললেন, 'এবার চল ব্যাটা, তোর বাড়িতে ব্রাহ্মণসেবার ব্যবস্থা দেখিগে।'
ভুবনের বাড়ি কাছেই। খুব ভয়ে-ভয়ে ভুবন দু-সেরি বাবাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকতেই দেখতে পেল ভেতরের বারান্দায় বসন্তকুমারী আর নয়নতারার হাতে খুন্তি।
বসন্তকুমারী বলছে, 'মুখপুড়ি, শাঁকচুন্নি...'

নয়নতারা বলছে, ‘ডাইনিবুড়ি, শনের নুড়ি...’
হঠাৎ দু-সেরি বাবা বাজখাঁই গলায় হাঁক মারল, ‘বসন্তকুমারী! নয়নতারা! তোমাদের এত অধঃপতন হয়েছে?’
অচেনা একটা লোককে হঠাৎ এরকম বজ্রগম্ভীর গলায় তাদের নাম ধরে ডাকতে দেখে দুজনেই থেমে গেল। তারপরই বসন্তকুমারী তেড়ে এল, ‘কে রে তুই ড্যাকরা?’
খুন্তি উঁচিয়ে নয়নতারাও বলল, ‘কে এলেনরে গুরুঠাকুর!’
দু-সেরি বাবা অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বলে উঠল, ‘ওরে, ঝগড়া করবি তো বাপের বেটির মতো কর। ও কীরকম ধারা মিনমিনে ঝগড়া তোদের? তোদের ঝগড়ার ছিরি দেখে কৈলাসে যে মা-দুর্গা হেসে কুটিপাটি। আমাকে ডেকে বললেন, ‘ওরে, এই দুজনের তো এখনও ঝগড়ার দুধের দাঁতই গজায়নি, তবু কেমন মিউমিউ করছে দ্যাখ। যা বাবা, ওদের একটু ঝগড়ার পাঠ দিয়ে আয়’।’
শাশুড়ি-বউ দুজনেই দুজনের দিকে একটু চেয়ে ঝগড়া ভুলে দু-সেরি বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ‘জোচ্চুরি করার আর জায়গা পাওনি! মা দুগ্গা পাঠিয়েছে তোমাকে! দেব ভূত ঝেড়ে।’
হাসি-হাসি মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দু-সেরি বাবা বলল, ‘ওরে, তোদের হবে। প্রতিভা আছে, সাধনা নেই। তাই তো আমার আসা।’
বসন্তকুমারী ফোঁস করে উঠল, ‘এঃ, কোথাকার কে আমাকে ঝগড়া শেখাতে এলেনরে!’
নয়নতারাও ঝেঁঝে উঠল, ‘দেব মুখে নুড়ো জ্বেলে।’
দু-সেরি বাবা মাথা নেড়ে বলল, ‘হচ্ছে না, হচ্ছে না। গলায় তোদের কোনো হুল নেই, বিষ নেই, ঝাঁঝ নেই, ধক নেই। কলজের জোর কম, দমেরও বালাই নেই। তা ছাড়া কোথায় দম পড়বে, কোথায় ফাঁক তারও তো ঠিকঠিকানা পাচ্ছি না। তোদের যে একেবারে গোড়া থেকে শেখাতে হবে। ওরে ভুবন, বাড়িতে তানপুরা নেই?’
‘আজ্ঞে না, মহারাজ।’
‘হারমোনিয়াম আছে?’
‘তা আছে একটা।’
‘শিগগির নামা। আর পারলে ওবেলা একজন খোলদার ধরে আনিস। ঝগড়ার সঙ্গে খোলটা জমে ভালো।’
ভুবন হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দিয়ে টুক করে সরে পড়ে সটান দোকানে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। বাড়িতে কী হচ্ছে ভেবে বুকটা বড়ো দুরুদুরু করল সারাক্ষণ।
দুপুরবেলা বাড়িতে এসে তাজ্জব। ভেতরের বারান্দায় দু-সেরি বাবা খেতে বসেছে। কাঁসার থালায় ভাত, থালা ঘিরে পঞ্চব্যঞ্জন। মাছের মুড়ো, তিনরকম মাছ, ধোঁকার ডালনা, বাটি-চচ্চড়ি, পায়েস, এলাহি আয়োজন। নয়নতারা ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করছে, বসন্তকুমারী কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছে দু-সেরি বাবাকে।
ভুবনকে দেখে দু-সেরি বাবা উদার গলায় বলে, ‘আয় বেটা, আয়। তোর ঘরে যে সাক্ষাৎ মা-মনসা আর চামুন্ডার বাস। তুই তো ভাগ্যবান রে। এ বলে আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে। তালিম দিতে গিয়ে দেখি দুজনেই ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে এসেছে। সাধনা করলে অনেক ওপরে উঠতে পারবে। তবে একটু সংযম, ধৈর্য আর পরিশ্রমের দরকার।’
‘যে আজ্ঞে, বাবা।’
দুপুরে দু-সেরি বাবা একটু টেনে দিবানিদ্রা দিল। ভুবন খেয়ে উঠে দেখল, তার মা আর বউ রান্নাঘরে মুখোমুখি বসে খাচ্ছে আর খুব ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা কইছে।
দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে উঠে ভুবন দেখল, দু-সেরি বাবা মাদুর পেতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে, তার একধারে বসন্তকুমারী, অন্যধারে নয়নতারা।

দু-সেরি বাবা বসন্তকুমারীর দিকে চেয়ে বলল, ‘এবার শুরু করো মা। মুখপুড়ি বলার সময় একটু শুদ্ধ নি লাগাতে হবে, মনে থাকে যেন।’
বসন্তকুমারী ভারি কুণ্ঠিত হয়ে বলল, ‘আমার কি আর বুড়োবয়সে ওসব হবে বাবা।’
‘আরে, হবে, হবে। আর নয়নতারা-মা, তুমি যখন ডাইনিবুড়ি বলবে তখন কড়ি মধ্যম...’
নয়নতারা লাজুক মুখে বলল, ‘বড্ড লজ্জা করছে যে বাবা...’
দৃশ্যটা দেখে ভুবনের চোখে জল এল। তার জীবনে যে এমন সুদিন আসবে তা সে কখনো কল্পনাও করেনি। না, লোকটা যদি ঠকজোচ্চোরও হয় তো হোক। ভুবন দু-সেরি বাবাকে ছাড়বে না।

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারি বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকি। তখন এত সব শহর, নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি, জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেইরকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো একনাগাড়ে তিন-চার কিংবা সাত দিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিনমাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন-জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারি সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচুগাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। একধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু-তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দলবেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড়ো সাহেবরা সে-খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দলবেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকিপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, 'এ-জায়গাটা কিন্তু তেমন ভালো নয় চাটুজ্জে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে-তাকে ঘরেদোরে ঢুকতে দেবেন না।'

কিংবা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নি এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, 'নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ-কান-নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলেপুলেদেরও সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভালো নয়।'

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, 'কাদের কথা বলছেন দিদি?'

পালিত-গিন্নি শুধু বললেন, 'সে আছে বুঝবেনখন।'

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। এক মাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধবয়সি বউ এসে বলল, 'ঝি রাখবেন?'

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নি একদিন সকালে এসে বললেন, 'নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে।' দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন, কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নি মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'ওদের ওরকমই ধারা। ঝি-টার

নাম কী বলুন তো?'
দিদিমা বললেন, 'কমলা।'
পালিত-গিন্নি মাথা নেড়ে বললেন, 'চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।'
দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো।'
পালিত-গিন্নি শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, 'সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা ভারি মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ-ঝি রাখুন।'
এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নি, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।
কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'
সে মাথা নীচু করে বলল, 'মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড়ো লজ্জা পাই।'
কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা-ভাবটা গেল না।
ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে-আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কী ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও ক্যাঁচকোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।
বহুকষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।
সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না...ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনও শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই এই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচন্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি

লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ-বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসার ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসার ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সংকোচের কিছু নেই, আমি বাঘ-ভাল্লুক নই...ইত্যাদি। সে-সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসার ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে! অ্যাঁ কী হয়েছে! এবং তারপর তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে সাপের জিবের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনও দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো কাঁদো মুখে চার-পাঁচ-সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়।

তখনকার মফসসল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলা-টেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, 'আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভালো। অতিআশ্চর্য খেলা।'

ভট্টাচার্যও বললেন, 'হ্যাঁ, অতিআশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি।'

দাদামশাই অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী? এ তো আপনিই দেখালেন!'

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, 'তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য।'

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়ে বললেন, 'তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?'

সবাই বলল, 'আঁশটে গন্ধ! কই, আমরা তো পাচ্ছি না।'

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পন্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, 'আলবাত আঁশটে গন্ধ। সে শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরা এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।'

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারি মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক সে ভালো। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এবাড়িতে থাকে কী করে?'

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, 'এসব কী কথা বলছেন মাসিমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?'

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ওই দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।'

'কারা?' দিদিমা তবু অবাক।

‘বুঝবে বাপু, রোসো।’ বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।
তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড়ো অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না-গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, ‘ওরে, কে আছিস?’ বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, ‘যা এটা ডাকে দিয়ে আয়।’ দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?’
সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, ‘না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কী। খুব ভালো ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।’
তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফরসা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলি পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না-ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরিশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপ-চাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, ‘দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খনাসুরও কেউ টের পায়নি।’
দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, ‘মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?’
সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, ‘সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।’
মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়োমাসি তখন কিছু বড়ো হয়েছে। অন্য মামা-মাসিরা নাবালক নাবালিকা। মা-র বড়ো লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, ‘আয় রে?’ অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সিই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড়ো হয়েছে, সেই বড়ো আর মেজোমামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, ‘কে খেলবি আয়।’ অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত। মামাদের বয়সিই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।
এই খেলা নিয়েই আর একটা কান্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালি টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভালো খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপটেন খেলা থামিয়ে রেফারিকে বলল, ‘ওরা বারোজন খেলছে।’ রেফারি গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারিই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপটেনকে ডেকে বললেন, ‘তোমাদের টিমে চার-পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।’
দুর্দান্ত সাহেব-রেফারি, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপটেন বুক ফুলিয়ে বলল, ‘গুনে দেখুন।’ রেফারি গুনে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।
দোমোহানীর টিম আরও তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারি আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, ‘দেয়ার আর অ্যাট লিস্ট টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।’

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিল পিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারি দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে বললেন, 'শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফরসা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?'

দোমোহানীর ক্যাপটেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারি আরও রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফসে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, 'আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?'

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, 'ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

'কে? কাদের কথা বলছ?'

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ করতেন, আর বলতেন, 'এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বউমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?'

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, 'এ ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, 'রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা।' এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটে-বাজারে যেসব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারি অদ্ভুত। যেমন বড়োমামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারি ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ওই বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না-থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না—আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই শুনছিস?'

অমনি একটা সমবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

'আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।'

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি। বলল, 'দাঁড়াব কেন? তোমার কীসের ভয়?'

বড়োমামা ধমক দিয়ে বলেন, 'ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।'

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়োমামা বাথরুমের কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, 'কীসের ভয় বললে না?'

বড়োমামা গম্ভীর হয়ে বললেন 'ভূতের।'
ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়োমামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা।'

এমন সময় একটা লোক খুব সহৃদয়ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল...

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে শিঙিমাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমশিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয়ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, 'এ তো ভালো কথা নয়! গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?'
এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সে-ও বলল, 'এ তো ভালো কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?'
এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।
দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ওই কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?

ধুলোটে কাগজ

নিরাপদর মা মারা যাওয়ার পর তার আর কেউ রইল না। বড্ড একা পড়ে গেল সে। মাকে ভালোবাসতও খুব। মা ছাড়া কেউ ছিল না কিনা! কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সারাদিন। বাড়িতে মন টিকতে চায় না মোটে। তার ঠাকুরদার আমলের এই বাড়িখানায় পাঁচ-ছ-টা ঘর। সব পুরোনো জিনিসে ঠাসা। পুরোনো আমলের বাক্সপ্যাঁটরা, তোরঙ্গ, কৌটোবাউটো, রাজ্যের ন্যাকড়া-ট্যাকড়া, ভাঙা লণ্ঠন থেকে ডালা-কুলো সব ডাঁই হয়ে আছে সারা বাড়িতে। মা যক্ষীর মতো এসব আগলে রাখত। কোন কাজে লাগবে কে জানে! কিন্তু নিরাপদ যেদিকেই তাকায় অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে, আর বড্ড হু-হু করে বুক।
গাঁয়ের বন্ধুরা আর পাড়াপ্রতিবেশীরা অবশ্য তাকে নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখল।
শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর গাঁয়ের মহাজন এবং মাতব্বর পশুপতি রায় একদিন গম্ভীরমুখে এসে বললেন, 'ওরে নিরাপদ, বাড়িটার বিলিব্যবস্থা কী করলি? তোর মা যতদিন বেঁচে ছিল কিছু বলিনি। অনাথা বিধবা মানুষ, তার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? কিন্তু টাকাগুলো তো আর ফেলে রাখতে পারি না। সুদে-আসলে যে অনেক দাঁড়িয়ে গেছে রে!'
নিরাপদ হাঁ। বলল, 'কীসের টাকা?'
পশুপতি রায় একখানা ধুলোটে কাগজ বের করে দেখাল, 'এই দেখ, তোর বাপের সই। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। বিশ হাজার টাকা হাওলাত নিয়েছিল বাড়ি আমার কাছে বাঁধা রেখে। সুদে-আসলে দেড় লাখ ছাড়িয়ে গেছে।'
বাবাকে নিরাপদর মনেই নেই। সে যখন ছোটো ছিল, তখন মারা যায়। বাপের সইসাবুদও তার চেনার কথা নয়। কিন্তু পশুপতি ডাকসাইটে মানুষ। তার দাপটে সবাই তটস্থ। পশুপতি রায়ের সুনাম নেই বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পায় না।
নিরাপদ মিনমিন করে বলল, 'তা আমাকে কী করতে হবে?'
পশুপতি রায় ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের অবশ্য-কর্তব্য। তা, তুই যদি বাপের ধার এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা শোধ করে দিতে পারিস তাহলে আর ঝামেলায় পড়তে হয় না।'
নিরাপদ ঢোক গিলে বলে, 'টাকা! টাকা কোথায় পাব? আমার তো খাওয়াই জুটছে না।'
'তাহলে তো বাপু বাড়িখানা ছাড়তে হচ্ছে। এই পুরোনো ঝুরঝুরে বাড়ির দাম তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা ওঠে কি না সন্দেহ। কিন্তু কী আর করা, কিছু টাকা বোকাদন্ডই যাবে আমার। দু-দিন সময় দিলুম। পরশুদিন সকালে এসে বাড়ির দখল নেব। আর শোন, আমার দুটো পাইক পাহারায় থাকবে। বাড়ির কোনো জিনিস পাচার করা চলবে না। বাড়ি থেকে তো দাম উঠবে না, পুরোনো মাল বেচে যদি আরও কিছু উশুল হয়।'
পশুপতি চলে গেল। কিন্তু দুটো ষন্ডামার্কা পাইক বাড়ির বারান্দায় লাঠি হাতে বহাল রইল। দুজনেই ভারি গম্ভীর।
নিরাপদ বুঝে গেল, সে চিপিকলে পড়ে গেছে। পশুপতি রায়ের থাবা থেকে বাড়িটা বাঁচানোর কোনো উপায় নেই। মুচকুন্দপুর গাঁয়ে বা তার আশপাশে এমন কেউ নেই যে পশুপতির সঙ্গে এঁটে উঠবে।
নিরাপদ একটু ভালোমানুষ আর একটু বোকা, আর একটু ভিতুও বটে। তাই সে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। বাড়ি ছাড়তে হলে সে যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন

পশুপতি কেন উদয় হয়নি কে জানে? আর মা থাকতে তার খাওয়াপরারও অভাব ছিল না। মা কীভাবে চালাত তা অবশ্য সে জানে না। কখনো জিজ্ঞেস করারও দরকার হয়নি।
পাইক দুজন তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে দেখে সে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।
পশুপতিকাকা ঘরের জিনিসপত্র সরাতে বারণ করে যাওয়ায় আরও ফাঁপরে পড়ে গেছে। ঘরের চাল-ডালে টান পড়েছে। ভেবেছিল দু-একটা পুরোনো বাসন বেচে দিয়ে চাল-ডাল কিনবে, এখন তো তাও হবে না। নিরাপদ এখন করে কী? কুয়ো থেকে জল তুলে একপেট জল খেয়ে সে ভিতরের দিকের দাওয়ায় বসে রইল চুপ করে। সামনে দেওয়াল-ঘেরা ছোটো উঠোন। দুটো পেঁপেগাছ। একটা আম আর পেয়ারাগাছ। আমগাছে বসে দুটো কাক সমানে ডাকছে। নিরাপদর মাথায় কোনো মতলব আসছে না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে। তবু উঠে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়ার গরজও নেই তার। মনটা বড্ড খারাপ।
এমন সময় সদর দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলেই দু-পা পিছিয়ে এল নিরাপদ। দুটো মুসকো পাইক রাগে গজরাচ্ছে। প্রথমজন বলল, 'তোর এতবড়ো সাহস যে, তুই পিছন থেকে আমাকে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছিস!'
অন্যজন বলল, 'বেয়াদব, নচ্ছার, এত তোর বুকের পাটা যে, পিছন থেকে আমার মাথায় গাঁট্টা মারলি!'
নিরাপদ ভয় পেয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'আ-আমি! কাকুরা কী যা-তা বলছেন? আমি মারব আপনাদের? আমি তো পিছনের দাওয়ায় বসেছিলাম!'
প্রথম পাইকটা খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, 'অন্যায় করে ফের মিথ্যে কথা! দেব ঘাড়টা মটকে?'
প্রথম পাইকটা দ্বিতীয় পাইকটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'দে না আমার হাতে ছেড়ে, গাঁট্টা কাকে বলে আমি ছোঁড়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'
নিরাপদ জীবনে কারো কাছে মারধর খায়নি। সে ভয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তাতে ভবি ভোলার নয়। দ্বিতীয় পাইকটা তার ঘাড় ধরে হেঁটমুন্ডু করে পেল্লায় একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিল। নিরাপদর মাথাটা ঝিনঝিন করে উঠল।
এই সময় তাকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাইকটা প্রথম পাইকটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই বিষ্টু, তুই আমার পিঠে কিল মারলি কেন রে?'
লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'আমি কিল মারলাম! বলিস কী? আমি তো তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না!'
'মিথ্যে কথা! কিল মেরে ফের ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে! বুঝেছি, একটু আগে যখন আমি বারান্দায় বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে একটু ঢুলে পড়েছিলাম, তখনই তুই গাঁট্টা মেরে গিয়ে ভালোমানুষের মতো তফাতে বসে পড়েছিলি।'
'দেখ পটা, বেশি বাড় ভালো না। জষ্টিমাসে কর্তাবাবুর বাগানের কাঁঠাল চুরি করে খেয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলি, সে-কথা আমি ভুলিনি। হিরু পাইকের নাগরা জুতো হারিয়ে ফেলে আমাকে চোর বলে বদনামও তুই-ই তাহলে রটিয়েছিলি! আজ তোকে ছাড়ছি না।'
'দেখ বিষ্টু, লাই দিলে কুকুরও মাথায় চাপতে চায়। তোর বহুত বেয়াদপি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আজ তোর শেষ দেখে ছাড়ব।'
এই বলতে বলতে দুজনের মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই লেগে গেল। নিরাপদ খিদে-তেষ্টা ভুলে দুই পাইকের লড়াই দেখতে লাগল। মারামারি করতে করতে দুজনে জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হইহই শুনে লোকজন ছুটে এসে ভিড় করে ফেলল। যত লড়াই-ই হোক একসময় তা শেষ হয়। এটাও হল। আধ ঘণ্টাটাক বাদে ধুলোমাখা দুটো পেল্লাই চেহারার লোক ছেঁড়া চুল, ফোলা চোখ, নড়া দাঁত আর রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে যে-যার বাড়ি চলে গেল। নিরাপদর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু কী নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়াটা লাগল, সেটা নিরাপদ বুঝতেই পারল না। তবে সে মনের আনন্দে রাত্রিবেলা ডাল-ভাত রান্না করে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় সদলবলে এসে হাজির। চোখ পাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, 'তুই নাকি আমার পাইকদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস। এত আস্পদ্দা তোর হয় কী করে?'

নিরাপদর একগাল মাছি। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, 'কর্তাবাবু, আপনার পাইকদের মারধর করার মতো অবস্থাই আমার নয়। আমি তাদের ভয়ে দরজায় খিল এঁটে ছিলাম।'

পশুপতি ফের হুংকার দেয়, 'মিথ্যে কথা! পাঁচজনে দেখেছে, তুই দুটো পাইককে উস্তমফুস্তম করে মেরেছিস। একজনের একটা চোখই বোধ হয় গেছে। পটার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আমি থানায় এত্তেলা দিয়ে এসেছি, তোকে তারা এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। সাতটি বছর যাতে জেলের ঘানি টানতে হয় তার ব্যবস্থা করে রাখছি।'

নিরাপদ ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মিনমিন করে তবু বলল, 'আজ্ঞে, তারা যে নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছিল, নিজের চোখে দেখা।'

'এখন নিজের পিঠ বাঁচাতে গল্প ফাঁদছিস? যাকগে, যা বলার আদালতে দাঁড়িয়ে বলিস। বাঘা উকিলের জেরায় সব কথা বেরিয়ে পড়বে। আজ থেকে চারজন পাইক এ বাড়িতে মোতায়েন থাকবে। গড়বড় দেখলেই লাঠিপেটা করার হুকুম দিয়ে যাচ্ছি।'

এবার আরও বড়ো মাপের চারজন পাইক বহাল হল। তাদের চেহারা দৈত্য-দানবের মতো। তারা বড়ো বড়ো সড়কি আর রামদা হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এঁটে বসল।

নিরাপদ ফের কাঁপতে কাঁপতে দরজায় খিল তুলে ভিতরের বারান্দায় বসে রইল। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

একটু বাদেই বাইরের দিকে প্রবল হুটোপাটি আর চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। দৌড়ে গিয়ে জানলায় উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে শরীর হিম হয়ে গেল তার। দেখল, একটা কুড়ি-একুশ বছরের রোগাভোগা চেহারার ছেলে চারজন দৈত্য-দানবের মতো পাইককে দমাদম লাঠিপেটা করছে। পাইকরাও লাঠি, সড়কি, দা চালাচ্ছে বটে। কিন্তু ছেলেটার তাতে কিছুই হচ্ছে না। বরং উলটে ছেলেটার লাঠির ঘায়ে পাইকদের কারো মাথা ফাটছে, কারো কনুই ভাঙছে, কেউ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে, আর সবাই মিলে আর্তচিৎকার করছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও, মেরে ফেললে, কেটে ফেললে...!'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ। চারটে পাইক চিতপটাং হয়ে পড়ে রইল, সাড়া নেই। ছোকরাটাকে ভারি চেনা চেনা ঠেকল নিরাপদর, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সে বলল, 'তুমি কে ভাই?'

কিন্তু কোথায় কে? ছোকরার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তার পরিত্যক্ত লাঠিটা পড়ে আছে বারান্দায়। লাঠিটা তুলে নিয়ে নিরাপদ হাঁ করে চেয়ে রইল। হঠাৎ শিউরে উঠে সে বুঝতে পারল, ছোকরাটা হুবহু তারই মতো দেখতে। আয়নায় সে নিজের চেহারাটা যেমন দেখেছে, অবিকল সেই চেহারা। তাই অত চেনা চেনা ঠেকছিল বটে!

স্তম্ভিত হয়ে সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ই একটা পুলিশের জিপ এসে বাড়ির সামনে থামল। দারোগাবাবু এবং জনাচারেক সেপাই নেমে এসে থমকে দাঁড়াল। চারজন ভূপতিত পাইক আর তার দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে দারোগাবাবু বললেন, 'ওঃ, তাহলে যা শুনেছি তা মিথ্যে নয়!'

দারোগাবাবু থমথমে মুখ করে বললেন, 'বটে ? তা,ছোকরাটা কে ?'

তাড়াতাড়ি লাঠিটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে দারোগাবাবু, কোথা থেকে একটা উটকো ছেলে এসে এই কাকুদের খুব মারধর করে গেছে। আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই।'
দারোগাবাবু থমথমে মুখ করে বললেন, 'বটে? তা, ছোকরাটা কে?'
'চিনি না।'
'তুমি না-চিনলেও আমরা যে তাকে বিলক্ষণ চিনি হে। তার নাম নিরাপদ সরকার, তাই না?'
নিরাপদ কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, এই পাইক কাকুদের ধারেকাছেও আমি আসিনি। আমি দরজায় খিল দিয়ে...'
দারোগা হাত তুলে বললেন, 'আর বলতে হবে না। এবার আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো থানায় চলো তো। তোমাকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। আমাদের ওপরেও হামলা করতে পারো। তাই আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। বেগড়বাঁই দেখলে কিন্তু গুলি চালিয়ে দেব।'
অগত্যা থানাতেই যেতে হল নিরাপদকে।
থানায় একজন মস্ত গোঁফওয়ালা হোমরাচোমরা গোছের লোক বসেছিলেন। চোখে ভ্রূকুটি, আর খুব রাশভারী মুখ। দারোগাবাবু তাঁকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনি এখানে?'
'হ্যাঁ, আমি। ফোনে বড়োকর্তার জরুরি হুকুম পেয়ে আসতে হল। তা, এই ছেলেটা কে? ধরেই বা এনেছেন কেন?'
দারোগাবাবু তখন সবিস্তার নিরাপদর গুণ্ডামির কথা বলে গেলেন। শুনে রাশভারী লোকটা আপাদমস্তক নিরাপদকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বয়স কত?'
ভয়ে নিরাপদর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে, কুড়ি-একুশ হবে।'
'বলি, পুলিশে চাকরি করবে?'
নিরাপদ ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে গোলমেলে মাথা নিয়ে চুপ করে রইল। ভুলই শুনে থাকবে। সে আজকাল ভুল শুনছে। ভুল দেখছেও।
রাশভারী লোকটা বলল, 'পুলিশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের খুব অভাব। আমরা তোমার মতো বাহাদুর ছেলেই চাই। দেরি নয়, আজকেই জয়েন করো। আজই সদরে গিয়ে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'
সবাই এমন হাঁ করে রইল যে, ছুঁচ পড়লে শোনা যায়।
পরদিন সকালেই পশুপতি রায় এসে হাজির। গোঁফ ঝুলে গেছে। চোখে করুণ দৃষ্টি। জোড়হাতে বলল, 'বাবা নিরাপদ, এবারের মতো মাপ করে দে বাপ। জালিয়াতির দায়ে যদি জেল খাটাস, তাহলে এই বুড়ো বয়সে কি বাঁচব? মাপ করে দে বাপ। এই তোর বাপের ধারের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি!'
নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'লে হালুয়া!'

ইঁদারায় গন্ডগোল

গাঁয়ে একটামাত্র ভালো জলের ইঁদারা। জল যেমন পরিষ্কার, তেমনি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, আর সে-জল খেলে লোহা পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।

লোহা হজম হওয়ার কথাটা কিন্তু গল্প নয়। রামু বাজিকর সেবার গোবিন্দপুরের হাটে বাজি দেখাচ্ছিল। সে জলজ্যান্ত পেরেক খেয়ে ফেলত, আবার উগরে ফেলত। আসলে কী আর খেত! ছোটো ছোটো পেরেক মুখে নিয়ে গেলার ভান করে জিভের তলায় কী গালে হাপিস করে রেখে দিত।

তা রামুর আর সেদিন নেই। বয়স হয়েছে। দাঁত কিছু পড়েছে, কিছু নড়েছে। কয়েকটা দাঁত শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে। তো সেই পড়া, নড়া আর বাঁধানো দাঁতে তার মুখের ভিতর এখন বিস্তর ঠোকাঠুকি, গন্ডগোল। কোনো দাঁতের সঙ্গে কোনো দাঁতের বনে না। খাওয়ার সময়ে মাংসের হাড় মনে করে নিজের বাঁধানো দাঁতও চিবিয়ে ফেলেছিল রামু। সে অন্য ঘটনা। থাকগে।

কিন্তু এইরকম গন্ডগোলের মুখ নিয়ে পেরেক খেতে গিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গেল সে-বার। পেরেক মুখে নিয়ে অভ্যেসমতো এক গ্লাস জল খেয়ে সে বক্তৃতা করছে। 'পেরেক তো পেরেক, ইচ্ছে করলে হাওড়ার ব্রিজও খেয়ে নিতে পারি। সেবার গিয়েওছিলাম খাব বলে। সরকার টের পেয়ে আমাকে ধরে জেলে পোরার উপক্রম। তাই পালিয়ে বাঁচি।'

বক্তৃতা করার পর সে আবার যথা নিয়মে ওয়াক তুলে ওগরাতে গিয়ে দেখে, পেরেক মুখে নেই একটাও। বেবাক জিভের তলা আর গালের ফাঁক থেকে সাফ হয়ে জলের সঙ্গে পেটে সেঁদিয়েছে।

টের পেয়েই রামু ভয় খেয়ে চোখ কপালে তুলে যায় আর কী! পেটের মধ্যে আট-দশটা পেরেক! সোজা কথা তো নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে পেটে ব্যথা, মুখে গ্যাঁজলা। ডাক্তার কবিরাজ এসে দেখে বলল, 'অন্ত্রে ফুটো, পাকস্থলীতে ছ্যাঁদা, খাদ্যনালি লিক, ফুসফুস ফুটো হয়ে বেলুনের মতো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা নেই।'

সেই সময়ে একজন লোক বুদ্ধি করে বলল, 'পুরোনো ইঁদারার জল খাওয়াও।'

ঘটিভর সেই জল খেয়ে রামু আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই লোহা হজম হয়ে গেছে।

ইঁদারার জলের খ্যাতি এমনিতেই ছিল, এই ঘটনার পর আরও বাড়ল। বলতে কী, গোবিন্দপুরের লোকের এই ইঁদারার জল খেয়ে কোনো ব্যামোই হয় না।

কিন্তু ইদানীং একটা বড়ো মুশকিল দেখা দিয়েছে। ইঁদারায় বালতি বা ঘটি নামালে দড়ি ছিঁড়ে যায়। দড়ি সবসময়ে যে ছেঁড়ে, তাও নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, বালতির হাতল থেকে দড়ির গিঁট কে যেন সযত্নে খুলে নিয়েছে। কিছুতেই জল তোলা যায় না। যতবার দড়ি বাঁধা বালতি নামানো হয়, ততবারই এক ব্যাপার। গাঁয়ের লোকেরা বুড়ো পুরুতমশাইয়ের কাছে গিয়ে পড়ল। 'ও ঠাকুরমশাই, বিহিত করুন।'

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'ভায়ারা, দড়ি তো দড়ি, আমি লোহার শেকলে বেঁধে বালতি নামালাম, তো সেটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর দেখি, জলের মধ্যে সব হুলুস্থুলু কান্ড হয়েছে। দেখেছ কখনো ইঁদারার জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে? কাল সন্ধেবেলায় দেখলাম নিজের চক্ষে। বলি, ও ইঁদারার জল আর কারো খেয়ে কাজ নেই।'

পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হরিহর রায়ের জমিদারি। রায়মশাই বড়ো ভালো মানুষ। ধর্মভীরু, নিরীহ, লোকের দুঃখ বোঝেন।

গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকেরা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির।

রায়মশাই কাছারিঘরে বসে আছেন। ফরসা নাদুসনুদুস চেহারা। নায়েবমশাই সামনে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন, 'আজ্ঞে গোবিন্দপুরের লোকেরা সব এসেছে দরবার করতে।'

রায়মশাই মানুষটা নিরীহ হলেও হাঁকডাক বাঘের মতো। রেগে গেলে তাঁর ধারেকাছে কেউ আসতে পারে না। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকদের ওপর তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর সেজোছেলের বিয়ের সময় অন্যান্য গাঁয়ের প্রজারা যখন চাঁদা তুলে মোহর বা গয়না উপহার দিয়েছিল, তখন এই গোবিন্দপুরের নচ্ছার লোকেরা একটা দুধেল গাই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে এক গাল হেসে নতুন বউয়ের হাতে সেই গোরু-বাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিল।

সেই থেকে রায়মশাইয়ের রাগ। গোরুটা যে খারাপ তা নয়। রায়মশাইয়ের গোয়ালে এখন সেইটেই সব চেয়ে ভালো গোরু। দু-বেলায় সাত সের দুধ দেয় রোজ। বটের আঠার মতো ঘন আর মিষ্টি সেই দুধেরও তুলনা হয় না। কিন্তু বিয়ের আসরে গোরু এনে হাজির করায় চারদিকে সে কী ছিছিক্কার! আজও সেই কথা ভাবলে রায়মশাই লজ্জায় অধোবদন হন। আবার রাগে রক্তবর্ণও হয়ে যান।

সেই গোবিন্দপুরের লোকেরা দরবার করতে এসেছে শুনে রায়মশাই রাগে হুহুংকার ছেড়ে বলে ওঠেন, 'কী চায় ওরা?'

সেই হুংকারে নায়েবমশাই তিন হাত পিছিয়ে গেলেন, প্রজারা আঁতকে উঠে ঘামতে লাগল, স্বয়ং রায়মশাইয়ের নিজের কোমরের কষি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেল।

গোবিন্দপুরের মাতব্বর লোক হলেন পুরুত চক্কোত্তিমশাই। তাঁর গালে সবসময়ে আস্ত একটা হত্তুকি থাকে। আজও ছিল। কিন্তু জমিদারমশাইয়ের হুংকার শুনে একটু ভিরমি খেয়ে ঢোক গিলে সামলে ওঠার পর হঠাৎ টের পেলেন, মুখে হত্তুকিটা নেই। বুঝতে পারলেন, চমকানোর সময়ে সেটা গলায় চলে গিয়েছিল, ঢোক গেলার সময়ে গিলে ফেলেছেন।

আস্ত হত্তুকিটা পেটে হজম হবে কি না কে জানে! একটা সময় ছিল, পেটে জাহাজ ঢুকে গেলেও চিন্তা ছিল না! গাঁয়ে ফিরে পুরোনো ইঁদারার এক ঘটি জল ঢকঢক করে গিলে ফেললেই জাহাজ ঝাঁঝরা। বামুন ভোজনের নেমন্তন্নে গিয়ে সেবার সোনারগাঁয়ে দু-বালতি মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা ভাজা সোনা মুগের ডাল খেয়েছিলেন, আরেকবার সদিপিসির শ্রাদ্ধে ফলারের নেমন্তন্নে দুটো আস্ত প্রমাণ সাইজের কাঁঠাল, এক অন্নপ্রাশনে দেড়খানা পাঁঠার মাংস, জমিদার মশাইয়ের সেজোছেলের বিয়েতে আশি টুকরো পোনা মাছ, দু-হাঁড়ি দই আর দু-সের রসগোল্লা। গোবিন্দপুরের লোকেরা এমনিতেই খাইয়ে। তারা যেখানে যায়, সেখানকার সব কিছু খেয়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দিয়ে আসে। সেই গোবিন্দপুরের ভোজনপ্রিয় লোকদের মধ্যে চক্কোত্তিমশাই হলেন চ্যাম্পিয়ন। তবে এসব খাওয়াদাওয়ার পিছনে আছে পুরোনো ইঁদারার স্বাস্থ্যকর জল। খেয়ে এসে জল খাও। পেট খিদেয় ডাকাডাকি করতে থাকবে।

সেই ইঁদারা নিয়েই বখেরা। চক্কোত্তিমশাই হত্তুকি গিলে ফেলে ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। হত্তুকি এমনিতে বড়ো ভালো জিনিস। কিন্তু আস্ত হত্তুকি পেটে গেলে হজম হবে কিনা, সেইটেই প্রশ্ন। পুরোনো ইঁদারার জল পাওয়া গেলে হত্তুকি নিয়ে চিন্তা করার প্রশ্নই ছিল না।

চক্কোত্তিমশাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাজামশাই, আমাদের গোবিন্দপুর গাঁয়ের পুরোনো ইঁদারার জল বড়ো বিখ্যাত। এতকাল সেই জল খেয়ে কোনো রোগ-বালাই আমরা গাঁয়ে ঢুকতে দিইনি। কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা, ইঁদারার জল আর আমরা তুলতে পারছি না।'

রায়মশাই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলের বিয়েতে যে বড়ো গোরু দিয়ে আমাকে অপমান করেছিলে?'

চক্কোত্তিমশাই জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, আপনাকে অপমান রাজামশাই? সেরকম চিন্তা আমাদের মরণকালেও হবে না। তা ছাড়া ব্রাহ্মণকে গো-দান করলে পাপ হয় বলে কোনো শাস্ত্রে নেই। গো-দান মহাপুণ্যকর্ম।'
রায়মশায়ের নতুন সভাপণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্যও মাথা নেড়ে বললেন, 'কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।'
রায়মশাই একটু নরম হয়ে বললেন, 'ইঁদারার কথা আমিও শুনেছি। সেবার আমার অগ্নিমান্দ্যের সময় গোবিন্দপুর থেকে পুরোনো ইঁদারার জল আনিয়ে আমাকে খাওয়ানো হয়। খুব উপকার পেয়েছিলাম। তা সে ইঁদারা কি শুকিয়ে গেছে নাকি?'
চক্কোত্তিমশাই ট্যাঁক থেকে আর একটা হত্তুকি বের করে লুকিয়ে মুখে ফেলে বললেন, 'আজ্ঞে না। তাতে এখনও কাকচক্ষু জল টলটল করছে। কিন্তু সে জল হাতের কাছে থেকেও আমাদের নাগালের বাইরে। দড়ি বেঁধে ঘটি বালতি যা-ই নামানো যায়, তা আর ওঠানো যায় না। দড়ি কে যেন কেটে নেয়, ছিঁড়ে দেয়। লোহার শিকলও কেটে দিয়েছে।'
রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, 'কার এত সাহস?'

রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, 'কার এত সাহস ?'

এবার হুংকার শুনে গোবিন্দপুরের লোকেরা খুশি হল। নড়েচড়ে বসল। মাথার ওপর জমিদারবাহাদুর থাকতে ইঁদারার জল বেহাত হবে, এ কেমন কথা!
ঠাকুরমশাই বললেন, 'আজ্ঞে মানুষের কাজ নয়। এত বুকের পাটা কারও নেই। গোবিন্দপুরের লেঠেলদের কে না-চেনে! গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো মাথার ওপর আপনিও রয়েছেন। লেঠেলদের এলেমে না-কুলোলে আপনি শাসন করবেন। কিন্তু একাজ যাঁরা করছেন তাঁরা মানুষ নন। অশরীরী।'
গোদের ওপর বিষফোড়ার উপমা শুনে একটু রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশরীরীর কথা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে কানে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন রায়মশাই, 'ওরে, বলিস না, বলিস না!'
সবাই তাজ্জব।
নায়েবমশাই রোষকষায়িত লোচনে গোবিন্দপুরের প্রজাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলো।'
চক্কোত্তিমশাই ভয়ের চোটে দ্বিতীয় হত্তুকিটাও গিলে ফেলতে ফেলতে অতিকষ্টে সামাল দিলেন।
রায়মশাইয়ের বড়ো ভূতের ভয়। পারতপক্ষে তিনি ও নাম মুখেও আনেন না, শোনেনও না। কিন্তু কৌতূহলেরও তো শেষ নেই। খানিকক্ষণ কান হাতে চেপে রেখে খুব আস্তে একটুখানি চাপা খুলে বললেন, 'কী যেন বলছিলি?'
চক্কোত্তিমশাই উৎসাহ পেয়ে বলেন, 'আজ্ঞে সে-এক অশরীরী কান্ড। ভূ—'
'বলিস না! খবরদার বলছি, বলবি না!' রায়বাবু আবার কানে হাতচাপা দেন।

চক্কোত্তিমশাই বোকার মতো চারদিকে চান। সবাই এ-ওর মুখে চাওয়াচায়ি করে। নায়েবমশাই 'চোপ' বলে একটা প্রকান্ড ধমক মারেন।

একটু বাদে রায়বাবু আবার কান থেকে হাতটা একটু সরিয়ে বলেন, 'ইঁদারার জলে কী যেন?'

চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ভয়ে ভয়েই বলেন, 'আজ্ঞে সে-এক সাংঘাতিক ভূতুড়ে ব্যাপার!'

'চুপ করো, চুপ করো! রাম রাম রাম রাম!' বলে আবার রায়বাবুর কানে হাত। খানিক পরে আবার তিনি বড়ো বড়ো চোখ করে চেয়ে বলেন, 'রেখে ঢেকে বলো।'

'আজ্ঞে বালতি-ঘটির সব দড়ি তেনারা কেটে নেন। শেকল পর্যন্ত ছেঁড়েন। তা ছাড়া ইঁদারার মধ্যে হাওয়া বয় না, বাতাস দেয় না, তবু তালগাছের মতো ঢেউ দেয়, জল হিলিবিলি করে কাঁপে।'

'বাবারে!' বলে রায়বাবু চোখ বুজে ফেলেন।

ক্রমে ক্রমে অবশ্য সবটাই রায়বাবু শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দিনটাই মাটি করলি তোরা। নায়েবমশাই, আজ রাতে আমার শোবার ঘরে চারজন দারোয়ান মোতায়েন রাখবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

গোবিন্দপুরের প্রজারা হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর, আপনার ব্যবস্থা তো দারোয়ান দিয়ে করালেন, এবার আমাদের ইঁদারার একটা বিলিব্যবস্থা করুন।'

'ইঁদারা বুজিয়ে ফেলগে। ও ইঁদারা আর রাখা ঠিক নয়। দরকার হলে আমি ইঁদারা বোজানোর জন্য গো-গাড়ি করে ভালো মাটি পাঠিয়ে দেবখন।'

তখন শুধু গোবিন্দপুরের প্রজারাই নয়। কাছারিঘরের সব প্রজাই হাঁ হাঁ করে উঠে বলে, 'তা হয় না হুজুর, সেই ইঁদারার জল আমাদের কাছে ধন্বন্তরি। তা ছাড়া জল তো নষ্টও হয়নি পোকাও লাগেনি, কয়েকটা ভূত —'

রায়বাবু হুংকার দিলেন, 'চুপ! ও নাম মুখে আনবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব।'

সবাই চুপ মেরে যায়। রায়বাবু ব্যাজার মুখে কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচার্য মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ তো লেঠেলদের কর্ম নয়, একবার যাবেন নাকি সেখানে?'

রায়মশাইয়ের আগের সভাপন্ডিত মুকুন্দ শর্মা একশো বছর পার করে এখনও বেঁচে আছেন। তবে একটু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভারি ভুলো মন আর দিনরাত খাই-খাই। তাঁকে দিয়ে কাজ হয় না। তাই নতুন সভাপন্ডিত রাখা হয়েছে কেশব ভট্টাচার্যকে।

কেশব এই অঞ্চলের লোক নন। কাশী থেকে রায়মশাই তাঁকে আনিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা বা পান্ডিত্য কতদূর তার পরীক্ষা এখনও হয়নি। তবে লোকটিকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। চেহারাখানা বিশাল তো বটেই, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল—তা সেও বেশি কথা কিছু নয়। তবে মুখের দিকে চাইলে বোঝা যায় চেহারার চেয়েও বেশি কিছু এঁর আছে। সেটা হল চরিত্র।

জমিদারের কথা শুনে কেশব একটু হাসলেন।

পরদিন সকালেই গো-গাড়ি চেপে কেশব রওনা হয়ে গেলেন গোবিন্দপুর। পিছনে পায়ে হেঁটে গোবিন্দপুরের শ-দুই লোক।

দুপুর পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে কেশব মোড়লের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে ইঁদারার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে গোবিন্দপুর আর আশপাশের গাঁয়ের হাজার হাজার লোক।

ভারি সুন্দর একটা জায়গায় ইঁদারাটি খোঁড়া হয়েছিল। চারদিকে কলকে ফুল আর ঝুমকো জবার কুঞ্জবন, একটা বিশাল পিপুলগাছ ছায়া দিচ্ছে। ইঁদারার চারধারে বড়ো বড়ো ঘাসের বন। পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।

কেশব আস্তে আস্তে ইঁদারার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা গম্ভীর। সামান্য ঝুঁকে জলের দিকে চাইলেন। সত্যিই কাকচক্ষু জল। টলটল করছে। কেশব আস্তে করে বললেন, 'কে আছিস! উঠে আয়, নইলে থুতু

ফেলব।'
এই কথায় কী হল কে জানে। ইঁদারার মধ্যে হঠাৎ হুলুস্থুলু পড়ে গেল। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ দিয়ে জল একেবারে ইঁদারার কানা পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ বোঁ বাতাসের শব্দ।
লোকজন এই কান্ড দেখে দে-দৌড় পালাচ্ছে। শুধু চক্কোত্তিমশাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।
'থুতু ফেলবেন না, থুতু ফেলবেন না।' বলতে বলতে ইঁদারা থেকে শয়ে শয়ে ভূত বেরোতে থাকে। চেহারা দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। রোগা লিকলিকে কালো কালো সব চেহারা, তাও রক্তমাংসের নয়—ধোঁয়াটে জিনিস দিয়ে তৈরি। সব ক-টার গা ভিজে সপসপ করছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে।
কেশব তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঢুকেছিলি কেন এখানে?'
'আজ্ঞে ভূতের সংখ্যা বড্ডই কমে যাচ্ছে যে! এই ইঁদারার জল খেয়ে এ তল্লাটের লোকের রোগবালাই নেই। একশো-দেড়শো বছর হেসে-খেলে বাঁচে! না-মলে ভূত হয় কেমন করে? তাই ভাবলুম, ইঁদারাটা দখল করে থাকি।'
বলে ভূতেরা মাথা চুলকোয়।
কেশব বললেন, 'অতিকূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।'
ভূতেরা আশকারা পেয়ে বলে, 'ওই যে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁরই বয়স এক-শো বিশ বছর। বিশ্বাস না-হয় জিজ্ঞেস করুন ওঁকে।'
কেশব অবাক চোখে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বলে কী এরা মশাই? সত্যি নাকি?'
একহাতে ধরা পৈতে, অন্য হাতের আঙুলে গায়ত্রী জপ করে ধরে রেখে চক্কোত্তি আমতা-আমতা করে বলেন, 'ঠিক স্মরণ নেই।'
'কূট প্রশ্ন। কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।' কেশব বললেন।
ঠিক এই সময়ে চক্কোত্তির মাথায়ও ভারি কূট একটা কথা এল। তিনি ফস করে বললেন, 'ভূতেরা কি মরে?'
কেশব চিন্তিতভাবে বললেন, 'সেটাও কূট প্রশ্ন।'
চক্কোত্তি সঙ্গেসঙ্গে বললেন, 'কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। ভূত যদি না-ই মরে, তবে সেটাও ভালো দেখায় না। স্বয়ং মাইকেল বলে গেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'
ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলে উঠল, 'তা সে আমরা কী করব? আমাদের হার্ট ফেল হয় না, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ হয় না— তাহলে মরব কীসে! দোষটা কি আমাদের?'
চক্কোত্তি সাহসে ভর করে বলেন, 'তাহলে দোষ তো আমাদেরও নয় বাবা-সকল।'
কেশব বললেন, 'অতিকূট প্রশ্ন।'
চক্কোত্তি বলে উঠলেন, 'কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।'
শ-পাঁচেক ছন্নছাড়া, বিদঘুটে ভেজা ভূত চারদিকে দাঁড়িয়ে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কেশবের দিকে তাকিয়ে আছে। কী রায় দেন কেশব!
একটা বুড়ো ভূত কেঁদে উঠে বলল, 'ঠাকুরমশাই, জলে ভেজানো ভাত যেমন পান্তা ভাত, তেমনি দিনরাত জলের মধ্যে থেকে থেকে আমরা পান্তা-ভূত হয়ে গেছি। ভূতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এত কষ্ট করলুম, সে-কষ্ট বৃথা যেতে দেবেন না।'
'এও অতিকূট প্রশ্ন।' কেশব বললেন।
চক্কোত্তিমশাই এবার আর 'আপাতগ্রাহ্য' বললেন না। সাহসে ভর করে বললেন, 'তাহলে ভূতেরও মৃত্যুর নিদান থাকা চাই। না-যদি হয় তবে আমিও ইঁদারার মধ্যে থুতু ফেলব। আর তারই বা কী দরকার! এক্ষুনি আমি সব ভূত বাবা-সকলের গায়েই থুতু ফেলছি।'

চক্কোত্তিমশাই বুঝে গেছেন, থুতুকে ভূতদের ভারি ভয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা আঁতকে উঠে দশ হাত পিছিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'থুতু ফেলবেন না! থুতু দেবেন না!'

কেশব চক্কোত্তিমশাইকে এক হাতে ঠেকিয়ে রেখে ভূতেদের দিকে ফিরে বললেন, 'চক্কোত্তিমশাই যে কূট প্রশ্ন তুলেছেন, তা আপাতগ্রাহ্যও বটে। আবার তোমাদের কথাও ফেলনা নয়। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ভূত কখনও মরে না। সুতরাং ভূত খরচ হয় না, কেবল জমা হয়। অন্যদিকে মানুষ দুশো বছর বাঁচলেও একদিন মরে। সুতরাং মানুষ খরচ হয়। তাই তোমাদের যুক্তি টেকে না।'

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলতে থাকে, 'আজ্ঞে অনেক কষ্ট করেছি।'

কেশব দৃঢ় স্বরে বললেন, 'তা হয় না। ঘটি-বাটি যা সব কুয়োর জলে ডুবেছে, সমস্ত তুলে দাও, তারপর ইঁদারা ছাড়ো। নইলে চক্কোত্তিমশাই আর আমি দুজনে মিলে থু—'

আর বলতে হল না। ঝপাঝপ ভূতেরা ইঁদারায় লাফিয়ে নেমে ঠনাঠন ঘটি-বালতি তুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটি-বালতির পাহাড় জমে গেল ইঁদারার চারপাশে।

পুরোনো ইঁদারায় এরপর আর ভূতের আস্তানা রইল না। ভেজা ভূতেরা গোবিন্দপুরের মাঠে রোদে পড়ে থেকে থেকে ক-দিন ধরে গায়ের জল শুকিয়ে নিল। শুকিয়ে আরও চিমড়ে মেরে গেল। এত রোগা হয়ে গেল তারা যে, গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও আর তাদের দেখে ভয় পেত না।

রাজার মন ভালো নেই

রাজার মন আর কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। মন ভালো করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে, নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার হাজার রকমের ভাঁড়ামি করেছে, যাত্রা, নাটক, মেলা-মচ্ছব, যাগযজ্ঞ, পূজোপাঠ সব হল। পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরের হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা বাদাম, দেশ-বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চীন রসুইকররা দু-বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুক কাঁপিয়ে হুংকারে এক-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। 'না হে, মনটা ভালো নেই।'

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়ি কখনো তেজি কখনও মহা, কখনো মোটা, কখনও সরু। রাজবৈদ্য আপন মনে হুঁ হুঁ হুঁ করেন, তারপর শতক রকম শেকড়-বাকড় পাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে শতক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান। রাজা খেয়ে যান! তারপর হড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। 'না হে মনটা ভালো নেই।'

রাজার মন ভালো করতে রাজপুত্তুর আর সেনাপতিরা আশপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজাগুলোকে বন্দী করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। 'মনটা বড়ো খারাপ হে।'

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলশকর পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজা শ-দেড়েক তীর্থ আর দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, 'হায় হায়। মনটা একদম ভালো নেই।'

ওদিকে ভাঁড়ামি করে করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভা-গায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় একটু গন্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন।

রাজ-পুরোহিত হোম-যজ্ঞে এত ঘি পুড়িয়েছেন যে ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপন্ডিতেরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজজ্যোতিষী রাজার জন্মকুন্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে কষে দিস্তা-দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলেছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুল-বাগিচায় বসে আছেন। চারদিকে হাজারো রকমের ফুলের বন্যা, রঙে গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দিঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে থেকে থেকে হঠাৎ সিংহগর্জনে বলে উঠলেন, 'গর্দান চাই।'

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপন মনে বিড়বিড় করছিলেন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, 'কার গর্দান মহারাজ।'

রাজা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়া দরকার।'

মন্ত্রী বললেন, 'ভাবুন মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।'

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনমতো একটা গর্দান দিলে বোধহয় মন ভালো হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভার কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'না হে, গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।'

বিকেলবেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বুলদার, মন্ত্রী। পায়চারি করতে করতে রাজা হঠাৎ নদীর ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বুড়ির ঘরে আগুন দে! দে আগুন বুড়ির ঘরে।'

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'যো হুকুম মহারাজ। শুধু বুড়ির নামটা বলুন।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কী বললাম বলো তো।'

'আজ্ঞে, এই যে বুড়ির ঘরে আগুন দিতে বললেন।'

রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, 'বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।'

সেদিনই শেষরাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, 'বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।'

'বিছুটি !' বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন ।

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।'

'বিছুটি!' বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গোরুরগাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেই দিকে মন নেই।

রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক ভাব। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে যতবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, 'পুঁতে ফেললে কেমন হয়?'

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'খুব ভালো হয় মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।'

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'কীসের ভালো হয়?' কিছুতেই ভালো হবে না মন্ত্রী। মনটা একদম খারাপ।'

মন্ত্রী বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলশকর, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রথ। বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে। রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু একটাও তির ছুড়লেন না। দুপুরে বনভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন, 'বাপরে। ভীষণ ভূত।'

মন্ত্রীমশাই সঙ্গেসঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজা মশাইয়ের সামনে এসে বললেন, 'তাই বলুন মহারাজ! ভূত! তা তারই বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে আনাচ্ছি, রাজ্যে যত ভূত আছে ধরে ধরে সব শূলে দেওয়া হবে।'

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, 'ভূত। না না, ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি কখনও মাথা ধরে?'

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'মাথা ধরলেও বদ্যিভূত আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।'

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড়ো খারাপ।'

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দরমহলের অলিন্দে রানির পাশাপাশি বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'চলো রানি, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।'

রানি তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, 'তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তাভাতের জোগাড় করো।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'পান্তাভাত? পান্তাভাত কী জিনিস বলো তো?'

'জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজেই তো পান্তাভাতের কথা বললেন।'

'বলেছি! তা হবে। কখন যে কী বলি। মনটা ভালো নেই তো, ভাই।'

মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চারজন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, 'ওরে তোরা আজ থেকে পালা করে রাজামশাইয়ের ওপর নজর রাখবি। চব্বিশ ঘণ্টা।'

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, 'রাজামশাই ভোর রাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।'

আর একজন বলল, 'রাজামশাই একা-একাই লালজামা নেব, লালজামা নেব, বলে খুঁতখুঁত করে কাঁদছেন।'

আর একজন এসে খবর দিল, 'রাজামশাই এক দাসীর বাচ্চা ছেলের হাত থেকে একটা মণ্ডা কেড়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন এইমাত্র।

চতুর্থ জন বলল, 'আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজামশাই খুব ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলছেন আর বলছেন সবই তো হল, আর কেন?'

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, 'ঠিক আছে, নজর রেখে যা।'

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, 'আজ্ঞে রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, 'নজর রাখছিস? রাখ'—বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।'

দ্বিতীয় জন এসে বলে, 'আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'কানে কেন্নো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়'।

তৃতীয় জন কান চুলকে লাজুক-লাজুক ভাব করে বলল, 'আজ্ঞে আমি বিকেলে রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালী সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, 'ওরে ভালো গুপ্তচর হতে গেলে

সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই।' বলে রাজা নিজেই গাছ কেটে দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনও এসে পৌঁছোয়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন।

ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলাকৌশল করতে যায়নি। সকাল বেলা রাজার শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি। আপনার ওপর নজর রাখছি।'

রাজা অবাক হলেও স্মিত হাসলেন। হাই তুলে বললেন, 'বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ করো।'

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, 'চিমটি দে। রাম চিমটি দে।'

সঙ্গেসঙ্গে রাখহরি রাজার পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁৎকে উঠে বললেন, 'করিস কী, করিস কী? ওরে বাবা।'

রাখহরি বলল, 'বললেন যে।'

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ল্যাং মেরে ফেলে দে।' বলতে-না-বলতেই রাখহরি ল্যাং মারল। রাজা চিৎপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। রাখহরি রাজার গায়ের ধুলো-টুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল। রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ'।

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনো ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার পিছু-পিছু শোওয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁত-খুঁত করে বলে উঠলেন, 'ঠাণ্ডা জলে চান করব, ঠাণ্ডা জলে...' রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো জলটা—সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে কেসে উঠে বসলেন। কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। রাখহরির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা শুগে যা।'

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দে বুকে ছোরা বসিয়ে দে...' চকিতে রাখহরি কোমরের ছোরাখানা খুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজা বললেন, 'থাক থাক, ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।'

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হো: হো: করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু-হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, 'ওরে আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ভীষণ হাসি পাচ্ছে।'

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাক বাবা! মন খারাপটা গেছে তাহলে।'

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললেন, 'ওঃ হো: হো:। কী আনন্দ! কী আনন্দ!'

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল আবার। কারণ কিছু নেই, রাজা সবসময়ে কেবল ফিকফিক করে হেসে ফেলছেন। খুব দুঃসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিকফিক। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিকফিক। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিকফিক।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।

জকপুরের হাটে

নটবর সাউ সন্ধে লাগতেই দোকান বন্ধ করে হাট করতে বেরিয়ে পড়ল। শেষ হাটে জিনিসপত্র বেজায় সস্তায় পাওয়া যায়। দোকানিরা ঝপাঝপ মাল বেচে হালকা হয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন।
জকপুরের হাট বেশি দূরেও নয়। আকন্দপুরের খালটা যেখানে মাওবেড়ের দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে শিবতলার মাঠে বিরাট জায়গা জুড়ে হাট। হ্যাজাক, টেমি, কারবাইডের আলো চারিদিকে ঝলমল করছে যেন। কেউ কেউ দোকান গুটিয়ে ফেলেছে, কেউ কেউ গোটাচ্ছে আবার কোথাও রমরম করে বিকিকিনি চলছে।
ব্যাপারিরা বেশিরভাগই নটবরের মুখ চেনা। এই যেমন রায়দিঘির বিখ্যাত বেগুন নিয়ে আসে মুকুন্দ পাল। সোনার গাঁয়ের ফুলকপি নিয়ে বসে শিবু গায়েন, চণ্ডীগড়ের বড়ো বড়ো লাল মুলো বেচতে আসে হারান দাস। নটবরের অবশ্য আজ অন্য দরকারেও আসা। হাটের পশ্চিম ধারে এক বুড়ো মতো মানুষকে মাঝে মাঝে টেমি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। তার লম্বা সাদা দাড়ি, বিশাল গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বয়স হেসেখেলে অন্তত পঁচাশি হবে। মুখখানার চামড়ায় অনেক ভাঁজ। মাথায় একটা সাদা টুপিও থাকে। মাঝে মাঝে গায়ে লাল রঙের কাপড় জুড়ে তৈরি একটা জোব্বা মতো। এই সাংঘাতিক শীতে খোলা মাঠের দিকে বসে বুড়ো কিছু পুথি-পুস্তক বিক্রি করতে বসে থাকে। গাঁয়ের লোক বইটই বেশি পড়ে না। তাই বুড়োর বিক্রিবাট্টাও নেই। তবুও বুড়ো বসে থাকে। হাটে এসে কৌতূহলের বশে নটবর তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল, বিচিত্র সব নাম—'মহাকাশের হাতছানি', 'পৃথিবীতে আজব মানুষের আগমন', 'সহজ উড়ন শিক্ষা', 'জাদুবলে রোগ আরোগ্য', 'দ্রব্যগুণের সাহায্যে গগনে বিহার'।
সবই বুজরুকি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৌতূহল এক সাংঘাতিক ব্যাপার, ঝোঁক চাপলে মাথাটা যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে যায়। নটবর কেনাকাটা সেরে বুড়োর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। টেমির আলোয় ম্লান পুরোনো বইগুলো হলদেটে দেখাচ্ছে। বুড়ো শীতে জবুথবু হয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বইটই আগের দিনই দেখে পছন্দ করে রেখেছিল নটবর—'সহজ ভূত নামাইবার কৌশল'।

'কে জানে বাপু, আমি তো পরখ করিনি !'

'ও দাদু!'

বুড়ো চোখ চেয়ে নটবরকে দেখে বেজার মুখে বলে, 'কী চাই?'
'এই বইখানার কত দাম?
'এক টাকা।'
'বইতে যা লেখা তাতে কাজ হয়?'
'কে জানে বাপু, আমি তো পরখ করিনি!'
'কাজ না-হলে বই ফেরত দেব কিন্তু?
'না বাবু, ওসব ফেরতটেরত হবে না। নিলে নাও, না-নিলে পথ দেখো।'
'আহা, এসব তো বুজরুকিও হতে পারে?'
'তা হতে পারে!'
নটবর একখানা টাকা ঠকাং করে ফেলে বইখানা তুলে নিল। গেল একখানা টাকা। তা আর কী করা যাবে। বইখানা পকেটে পুরে নটবর বাড়ি রওনা হল।
না, ভূতে নটবরের বিশ্বাস নেই। সে ভূতটুত মানে না। এই নিয়ে বন্ধু ভজহরির সঙ্গে তার প্রায়ই তর্ক হয়। ভজহরি আবার ঘোরতর ভূতে বিশ্বাসী। প্রায়ই বলে, 'এখন মানছ না, কিন্তু একদিন ঠেলায় পড়ে মানবে।'
ভূত না-মানলেও কৌতূহলকে তো আর ঠেকানো যায় না।
আজ বড়োই শীত পড়েছে। তার গ্রাম শামুকখোলা একটু দূরেই। ভারি থলি দু-খানা দু-হাতে ঝুলিয়ে যথাসাধ্য জোরেই হাঁটছে নটবর। কুয়াশায় পথঘাট আবছা, তবে একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্না থাকায় তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। রথতলা ছাড়িয়ে আমবাগানের পাশের রাস্তায় সবে পা দিয়েছে—এমন সময় একটা লোক পিছন থেকে তার পাশাপাশি এসে পড়ল।
লোকটা বলে উঠল, 'শামুকখোলা যাচ্ছেন নাকি মশাই?'
'হ্যাঁ।'
'ভালো ভালো। তা হাটে আজ কেমন কেনাকাটা হল?'
'এই টুকিটাকি।'
'মুলো, বেগুন সব পেলেন?'
'তা পেলুম।'
'বেশ বেশ।'
'তা আপনি কোনদিকে?'
'এই একটু বিষয় কার্যে এসে পড়েছিলুম এই দিকে। তা আর কী কিনলেন?'
'এই ঘরগেরস্থের টুকিটাকি জিনিস।'
লোকটা হেসে বলল, 'আছে কিন্তু।'
'কী আছে ?'
'ওই যা বলছিলাম আর কি। আচ্ছা মশাই আসি, এই ডানহাতি আমার রাস্তা।'
নটবর ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারল না। উটকো লোকটা যে কোথা থেকে উদয় হল, কোথায় অস্ত গেল কে জানে।
সামনেই বাঁ-ধারে কপালী দিঘি। চারধারে গাছগাছালি। দিঘির কোল ঘেঁসে রাস্তাটা পেরোনোর সময় হঠাৎ নটবরের মনে হল সামনের ঘাটে কে যেন চান করছে। এই শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলে চান করে কে ?
ঘাটের কাছে পৌঁছে দেখল চান করে একটা মোটাসোটা লোক উঠে এল। গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল, 'হাটে গিয়েছিলেন বুঝি?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আপনি এই শীতে রাতে চান করছিলেন যে ?'
'চান না-করলে শরীরটা বড়ো ম্যাজম্যাজ করে। সারাদিনে আমি বার পঁচিশেক চান করি কি না!'

‘বলেন কী? ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে যে?’
লোকটা একটু হেসে বলে, ‘আরে না, নিউমোনিয়া কি আর সকলের হয়! তা হাটে কী কী পেলেন ?’
‘এই একটু শীতের শাকপাতা।’
‘শুধু শাকপাতা?’
‘আর এই টুকিটাকি।’
‘শুধু টুকিটাকি।’
‘এই সামান্য জিনিসপত্তর।’
লোকটি গা মুছতে মুছতে বলল, ‘তা বলে ভাববেন না যে নেই।’
‘কী ভাবব না?’
‘এখনও আছে, অনেক আছে। যাই আর একবার ডুব দিয়ে আসি।’
লোকটা ফের জলে নেমে গেল। হ্যাঁ! আচ্ছা পাগল তো!
গাঁয়ের কাছ বরাবর চলে এসেছে নটবর। জটেশ্বরের খালের সাঁকোটা পেরোলেই গাঁয়ের সীমানায় ঢুকে পড়বে।
সাঁকোতে পা দিতেই নটবর দেখতে পেল সাyকোর মাঝ বরাবর বাঁশের রেলিং-এর হাতে ভর রেখে একটা লোক ঝুঁকে জলের দিকে চেয়ে আছে। নটবর সাঁকোতে উঠতেই ‘মচাৎ’ করে শব্দ হওয়ায় লোকটা ফিরে তাকাল। চেনা মানুষ নয়।
‘নটবরবাবু নাকি?’
‘হ্যাঁ।’
‘হাট করে ফিরলেন?’
‘হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?’
‘মাছ ধরছি।’
‘মাছ ধরছেন!’
‘মাছ ধরছেন!’ বলে নটবর হাঁ হয়ে গেল! সাঁকোর ওপর থেকে এই রাত্তিরে মাছ ধরা যায় বলে সে জন্মে শোনেনি। হেসে বলল, ‘কীভাবে ধরছেন? মন্তর দিয়ে নাকি?’
‘না ছিপ দিয়ে। দেখবেন?’ লোকটার হাতে যে ছিপ রয়েছে সেটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি নটবর। এবার করল। লোকটা ডান হাতের ছিপটা হঠাৎ করে ‘ছপাৎ’ করে ওপরে তুলতেই দেখা গেল বঁড়শিতে বেশ বড়োসড়ো একটা মাছ লাফঝাঁপ করছে। তাজ্জব ব্যাপার।
‘দেখলেন তো নটবরবাবু?’
‘দেখলাম। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।’
‘না, না, এ আর বিস্ময়ের কী? তা হাটে যা খুঁজতে গিয়েছিলেন তা পেলেন?’
‘তা পেলাম, শীতের শাকসবজি আর কি!’
‘উঁহু, ওসব নয়। আর যা খুঁজতে গিয়েছিলেন।’
‘এই টুকিটাকি সব জিনিসপত্র। ঘরগেরস্থালিতে তো কত কিছুই লাগে।’
‘সে আমি জানি। কিন্তু সে-সব ছাড়া আর কিছু?’
‘না, আর বিশেষ কী?’
‘কী যে বলেন নটবরবাবু। যাকগে, কথাটা হল—ওসব নিয়ে বেশি মাথা না-ঘামানোই ভালো।’
‘কী সব নিয়ে! কীসের কথা বলছেন?’
‘বলছিলাম কী, দু-তরফা নিজের নিজের মতো করে আছে। কাজ কী বলুন অন্য তরফের তল্লাশ নিতে যাওয়ার। ওতে অন্য তরফের বড্ড অসুবিধে হয় কিনা।’

দুই তরফা! নটবর হঠাৎ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কোন তরফের কথা বলতে চাইছে লোকটা?
‘আচ্ছা আসি নটবরবাবু।’ বলে লোকটা হনহন করে তার পাশ কাটিয়ে উলটো দিকে চলে গেল। তাকে ভেদ করেই গেল যেন! কিন্তু নটবরের গায়ে একটু ছোঁয়াও লাগল না। হঠাৎ নটবরের গা শিউরে উঠল।
‘বাপরে!’ বলে বাজারের থলি ফেলে নটবর প্রাণপণে ছুটতে লাগল। পড়ি কি মরি অবস্থা।
পরদিন সে ভজহরিকে গিয়ে বইখানা দান করে বলল, ‘আছেরে ভাই আছে।’
ভজহরি একগাল হেসে বলল, ‘বলেছিলাম কি না।’

গুপ্তধন

ভূতনাথবাবু অনেক ধার-দেনা করে, কষ্টে জমানো যা-কিছু টাকাপয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তাঁর বাড়ির কারও পছন্দ হল না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন-চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেয়ালে শ্যাওলা, অশ্বত্থের চারা গজাচ্ছে, দেয়ালের চাপড়া বেশির ভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো-টুটো। মেঝের অবস্থাও ভালো নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিঁটকে বলেই ফেললেন, 'এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়। ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয় তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়। তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছ ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।

কথাটা ঠিক। এই মহিগঞ্জের মতো ছোটো গঞ্জেও বাড়ি ভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওলা নিত্যই তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলে-মেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি-খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোyছ করতে আর ঘর সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে ধীরে বাড়ির একটা লক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ-চিঁড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসীর মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, 'পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা আপনি কে?'

'আজ্ঞে আমি হলুম পরানচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।'

'অ। তা কাকে খুঁজছেন?'

'আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে, তা বাবু, কিছু পেলেন-টেলেন? সোনাদানা বা হিরে-জহরত কিছু?'

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, তাই বলো! এইজন্য পুরোনা বাড়ি খুঁজে বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

‘ভালো করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে ঠুকে দেখবেন কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয় কিনা।’

‘বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কী আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।’

পরান তবু হাল না-ছেড়ে বলল, তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশো বছরের পুরোনো বাড়ি।

তা হতে পারে।

আর একটা কথা বাবু, তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?

কে? কাদের কথা বলছ?

ওই ইয়ে আর কি—ওই যে রামনাম করলে যারা পালায়।

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।

না বাবু, অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তাঁরা কুপিত হলেই মুশকিল।

তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তাঁরাও থাকবেন, আমিও থাকব।

একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বোসো বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।

লোকটা সসংকোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, তা বাবু, বাড়িটা কতয় কিনলেন?

তা বাপু, অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকার্জও হয়ে গেল মেলা।

উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।

গবিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড্ড ধকল গেছে।

আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি। ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধে হয়-হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরান দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হল। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, তা পরান, তুমি এখন কোথাও যাবে?

পরান একটা হাই তুলে বলল, তাই ভাবছি।

ভাবছ মানে! তোমার বাড়ি নেই?

আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরোনো বাড়ি অনেক সময় ভারি পয়মন্ত হয়।

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আহা, এই সন্ধেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো তোমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে ঢুকলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন-চারখানা ঘর আছে। বস্তা-টস্তা পেতে শুতে পারবে না?

পরান দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল-সোজা গাঁয়ের লোক দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, চোরটোর নয় তো?

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকাপয়সা কোথায়?

পরান দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা খেঁটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুক ঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কান্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হল। পাগল আর কাকে বলে।

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোল। শুধু পরান দাস বলল, আমি একটু চারদিক ঘুরেটুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কান্ড ঘটে কিনা।
মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, কে?
সামনে হ্যারিকেন হাতে পরান দাস। চাপা গলায় বলল, পেয়েছি বাবু।
অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, কী পেয়েছ?
যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না-দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।
ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, বুড়োকর্তাটা আবার কে?
একশো বছর আগে এ বাড়িটা তো তাঁরই ছিল কিনা। বড্ড ভালো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন দুধে-আলতায়। খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।
একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, তুমি নিজে তো পাগল বটেই, এবার আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।
বিশ্বাস হল না তো বাবু। আসুন তাহলে, নিজের চোখেই দেখবেন।
বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতূহলও হল।
পরাণ দাসের পিছু পিছু বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তূপাকার ইট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।
এসব কী করেছ হে পরান? মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছ।
যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।
হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালোমতো কলসিজাতীয় কিছু।
আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারি, দুজনা না-হলে টেনে তোলা যাবে না।
ভূতনাথবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। বললেন, কী আছে ওতে?
তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।
ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখঢাকা ভারি কলসিটা দুজনে মিলে অতিকষ্টে তুললেন ওপরে। পরান একগাল হেসে হেসে বলল, এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।
বেশ বড়ো পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হ্যারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।
বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো। যান, আপনার আর কোনো দুঃখ থাকল না। দু-তিন পুরুষ হেসেখেলে চলে যাবে।
ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরানের দিকে চেয়ে বললেন, এসব সত্যি তো! স্বপ্ন নয় তো!

তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না ?

না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়ো কর্তার সব কিছু এর মধ্যে। এত দিনে গতি হল।
ভূতনাথবাবু পরানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পাগল হলেও তুমি খুব ভালো লোক। এর অর্ধেক তোমার।
পরান সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকাপয়সায় আমার কী হবে বাবু?
তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?
না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকাপয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।
ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?
আজ্ঞে, ওইটে আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।
পরান দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাব? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

হর বনাম কালী

কালীপদ মন্ডলের আত্মাকে তাড়া করে-করে হর কাপালিক হাপসে পড়েছে। কালীপদ আজ সকালেই গত হল। তা গত হওয়ার আগেই সেই রাত বারোটার সময় কালীপদর বউ গিয়ে তার হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'মিনসে দু-কলসি রুপোর টাকা আর দেড়শো মোহর কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কিছুতেই বলছে না। বাবাজি। যদি পটল তোলে তাহলে যে সব যাবে।'
হর কাপালিক গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'তা বন্দোবস্ত কীরকম হবে?'
কালীপদর বউ তখন চোখের জলে ভেসে বলেছিল, 'দশটা রুপোর টাকা দেব বাবাজি, এর বেশি আর চেয়ো না।'
হর হা: হা: করে হেসে বলেছিল, 'ছুঁচো মেরে আমি হাত গন্ধ করি না। আর রুপো? ওর আর কী এমন দাম!'
তা দরদস্তুর একটা ঠিক হল। হদিশ হলে হর কাপালিক দশ মোহর আর বিশ রুপোর টাকা পাবে।
রাত দেড়টায় কালীপদর বাড়ি গিয়ে যা অবস্থা দেখল হর, তা সুবিধের নয়। কালীপদর বাক্য হরে গেছে, চোখ উলটে গোঁ-গোঁ করছে। হর অনেক মন্তর-তন্তর ছাড়ল বটে, তাতে সুবিধে হল না। কালীর মুখ থেকে বাক্যি বেরোল না। গোঁ গোঁ যে আওয়াজ বেরোচ্ছিল তার মর্মোদ্ধার করতে পারলে হয়তো হত। কিন্তু সে বিদ্যে হরর জানা নেই।
কালীর বউ দাক্ষায়ণী চেঁচাচ্ছিল, 'বাবাজি, এ যে পটল তুলল বলে! ভালো করে মন্তর ঝাড়ো, নইলে যে সব গেল গো!'
হর দেখল, কালীর হয়ে এসেছে। আত্মাটা বেরোল বলে! এই অবস্থায় তার মুখ থেকে বাক্যি বের করা অসম্ভব। তবে উপায় আছে। আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরোলে সেটাকে কপ করে ধরে একটু শোধন করে ফের শরীরের মধ্যে চালান দিলে কালী ধড়ফড় করে উঠে পড়বে। তখন বাক্যি বের করা জলবত্তরলং।
তক্কে-তক্কে ছিল হর। সকালের দিকটায় আত্মাটা প্রথম উঁকি মারল নাকের ফুটো দিয়ে। কিন্তু মুন্ডুটা বের করে হরকে দেখেই সুড়ুৎ করে ফের ভেতরে ঢুকে গেল।
দাক্ষায়ণী ফের চেঁচামেচি জুড়ে দেওয়ায় হর একটা পেল্লায় ধমক দিল, 'চোপ! অমন চেঁচামেচি করলে আত্মাটা যে ভিরমি খাবে বাপু! তখন এমন ডুব মেরে থাকবে যে, টিকিটারও নাগাল পাওয়া যাবে না।'
আধ ঘণ্টাটাক বাদে আত্মাটা কালীর বাঁ-কানের ভিতর থেকে উঁকি দিতেই হর কপাত করে থাবা মারল। কিন্তু অল্পের জন্য হল না। আত্মাটা টুক করে মুন্ডু সরিয়ে নিল।
বারবার তিনবার। হর কাপালিক বাঘের মতো খাপ পেতে বসেছিল। এবার যাতে আর ব্যাটা ঢুকতে না-পারে।
কিন্তু কী হল, এই সময়ে একটা নচ্ছার মশা কোথা থেকে এসে নাচতে-নাচতে কালীর নাকের মধ্যে ঢুকে গেল। আর তাই সর্বনাশ। মশার তাড়নায় মৃতপ্রায় কালীও হঠাৎ প্রবল একখানা হ্যাঁচ্চো দিয়ে ফেলল। আর তখনই আত্মাটা গুডুলের মতো মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পাঁই-পাঁই করে পালাতে লাগল।
তা হরও ছাড়বার পাত্র নয়। 'ধর! ধর!' বলে করল তাড়া।
তা ধরা কি সহজ? কালীর আত্মা এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে গিরীশ নন্দীর আমবাগানে ঢুকে পড়ল। তারপর একটা গাছের ডালে চড়াই পাখিটির মতো বসে ইতি-উতি চাইতে লাগল।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে হর কাপালিক প্রথমটায় চোখ রাঙিয়ে খুব ধমকাল, ‘নেমে আয়! নেমে আয় বলছি! নইলে কী হবে জানিস তো? এমন ঝাঁটাপেটা আর সরষেপোড়া দেব যে, আবার তোর মরতে ইচ্ছে করবে।’
কিন্তু ধমকে কাজ হল না। কালীর আত্মা দিব্যি ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের ডালে বসে রোদ পোয়াতে-পোয়াতে চারদিকের দৃশ্য দেখতে লাগল।
হর তখন কাকুতিমিনতি করতে লাগল, ‘নেমে আয় বাপু, নেমে আয়। অমন মগডালে বসে থাকিসনি। পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে। কাজটা কি ঠিক হচ্ছেরে? মরবি মর, তা বলে পরিবারটাকে ভাসিয়ে যাওয়াটা কি ভালো কাজ হচ্ছেরে! নরকে যাবি যে! আয় বাপু, নেমে আয়, আবার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়, কত আনন্দ হবে দেখিস।’
তা কালীর আত্মা তাকে মোটেই পাত্তা না-দিয়ে ফের উড়ল। তারপর উড়তে-উড়তে পুরোনো জমিদারবাড়ির মস্ত উঁচু দেউড়ির মাথায় যে পাথরের পরিটা আছে তার মাথায় বসে যেন মনের আনন্দে গান গাইল কিছুক্ষণ। না, গানটা অবশ্য শুনতে পেল না হর। সে আঠাকাটি, জালদড়ি নিয়ে নানারকম কসরত করতে লাগল। যদি আত্মাটাকে নামিয়ে এনে ঝোলায় পোরা যায়।
কিন্তু কালীর আত্মা মহাট্যাটন। কিছুক্ষণ গানটান গেয়ে আবার উড়ল। হর দৌড়োতে লাগল পিছু-পিছু। শুধু কি দৌড়! কখনো পুকুরে নামতে হল, কখনও খালের জলে পড়ল, কখনও কাঁটাগাছে ক্ষতবিক্ষত হতে হল। শেষে তেপান্তরের মাঠের মতো একটা ফাঁকা মাঠে একটা সজনেগাছের ডাল ধরে কালীর আত্মা দিব্যি ঝুল খেতে-খেতে তাকে মুখ ভেংচে বলল, ‘তোমার কেরদানি জানা আছে।’
হর হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, ‘নেমে আয় বাপু, তোর গায়ে আঁচড়টিও কাটব না। ভালো করে ধুইয়ে-মুছিয়ে শরীরটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। তারপর তোর ছুটি।’
‘হেঁ: হেঁ:। অত সোজা নয় হে। ফের শরীরের মধ্যে ঢোকাবে আর দাক্ষায়ণী দু-বেলা আমাকে উস্তম-কুস্তম করে ভূত ঝাড়বে তা আর হচ্ছে না। এই যে বেরিয়ে পড়েছি, কী যে আনন্দ হচ্ছে তা বলার নয়। এখন খাবদাব, মজা করে ঘুরব।’
‘তোর আক্কেলের বলিহারি যাই। আত্মা আবার খায় নাকি? খেতে হলে মুখ চাই, পেট চাই, দাঁত চাই, জিভ চাই। তা তুই সে-সব পাবি কোথায়? ছেলেমানুষি করিস না, নেমে আয়। শরীরে ঢুকলে সব পাবি। দাঁত, জিভ, পেট সব। তখন কত খাবি দেখিস।’
‘হ্যাঁ, দাক্ষায়ণী আমাকে খাওয়াবে! বেঁচে থাকতে কী খেতে দিত জানো? কচু, ঘেঁচু আর আলুপোড়া। যা হে বাপু, এই আমি বেশ আছি।’
‘নারে না, তুই মোটেই বেশ নেই। বাপুরে, এরকম বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ানো কি ভালো? ঝড়-বৃষ্টি-শীতে কষ্ট পাবি যে। ছাতা পাবি না, কম্বল পাবি না। তার ওপর যমদূতেরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেলেই ধরে যমরাজের কাছে হাজির করবে। বড্ড হেনস্থা হবি যে। নেমে আয় বাপু।’
‘না হে না, ওসব হচ্ছে না। তোমার মতলব বেশ জানি। দু-ঘড়া রুপোর টাকা আর দেড়শো মোহরের লোভেই এসব করছ তো! অত সোজা নয়। সে-খবর আমি কাউকে দেব না।’
‘তবে রে!’ বলে হর ফের তাড়া করল। কালীর আত্মা ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল।
ছুটতে ছুটতে হর কাপালিকের ঘাম ছুটে গেল। পা আর চলে না। চোখে সরষেফুল নৃত্য করতে লাগল। হর কাপালিক একটা গাছতলায় বসে অনেকক্ষণ দম নিল হ্যা-হ্যা করে। কালীর আত্মা পগারপার হয়েছে।
ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে, কাঁকালে ব্যথা নিয়ে হর কাপালিক যখন ফিরে আসছিল তখন হঠাৎ দূর থেকেই শুনতে পেল, কালীপদর বাড়িতে খুব শোরগোল হচ্ছে।
হর গিয়ে কালীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে গেল। কালী দিব্যি বসে-বসে ফলার করছে আর দাক্ষায়ণী দাঁড়িয়ে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে তাকে।

হর বলল, 'অ্যাঁ! আত্মাটা তাহলে ঢুকে গেছে দেখছি! ঢুকবেই জানতাম। যা তাড়া করেছিলাম তা আর বলার নয়!'

কালীপদ খেঁচিয়ে উঠে বলল, 'কীসের ভাগজোখ হে ! অ্যাঁ ! 'কীসের ভাগজোখ ?'

দাক্ষায়ণী বলল, 'বাবাজির যেমন কথা! আত্মা ঢুকবে কী গো! সেই যে হাঁচি দিল তাইতে তুমি তো ভয় খেয়ে পালালে। আর ওই হাঁচির পরই তো ইনি দিব্যি উঠে বসলেন।'
'অ্যাঁ!'
'হ্যাঁ।'
'ও তাহলে মন্তরেই কাজ হয়েছে। ঠিক আছে, এবার তাহলে ভাগজোখ হয়ে যাক।'
কালীপদ খেঁচিয়ে উঠে বলল, 'কীসের ভাগজোখ হে! অ্যাঁ! কীসের ভাগজোখ?'
হর একটু দমে গিয়ে বলল, 'আমার কিছু পাওনা হয়।'
'কচু হয়। যাও, যাও, এখন বিরক্ত কোরো না। অনেকদিন পর বাড়িতে একটু আদরযত্ন পাচ্ছি।'
হর কাপালিকের ইচ্ছে হল, হাতের চিমটেটা দিয়ে কালীকে ঘা কতক দেয়। তারপর আত্মাটাকে বের করে কমন্ডলুতে পুরে নিয়ে যায়। কিন্তু সে-সব করতে সাহস হল না। দাক্ষায়ণী তার দিকে যে চোখে চাইছে তা সুবিধের নয়। ট্যা-ফোঁ করলে হয়তো পাখার বাঁট দিয়ে ঘা কতক বসিয়ে দেবে! কালীর বেঁচে থাকা মানে দু-ঘড়া রুপো আর দেড়শো মোহর।
হর কাপালিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রওনা দিল।

লোকটা

সোমনাথবাবু সকালবেলায় তাঁর একতলার বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। সামনেই মস্ত বাগান, সেখানে খেলা করছে তাঁর সাতটা ভয়ংকর কুকুর। কুকুরদের মধ্যে দুটো বকসার বুলডগ, দুটো ডবারম্যান, দুটো অ্যালসেশিয়ান, একটা চিশি সড়ালে। এদের দাপটে কেউ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তার ওপর গেটে বাহাদুর নামের নেপালি দারোয়ান আছে। তার কোমরে কুকরি, হাতে লাঠি। সদাসতর্ক, সদাতৎপর। সোমনাথবাবু এরকম সুরক্ষিত থাকতেই ভালোবাসেন। তাঁর অনেক টাকা, হিরে-জহরত, সোনাদানা।

কিন্তু আজ সকালে সোমনাথবাবুকে খুবই অবাক হয়ে যেতে হল। ঘড়িতে মোটে সাতটা বাজে। শীতকাল। সবে রোদের লালচে আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে বাগানের ফটক খুলে বেঁটেমতো টাকমাথার একটা লোক ঢুকল। দারোয়ান বা কুকুরদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। পাথরকুচি ছড়ানো পথটা দিয়ে সোজা বারান্দার দিকে হেঁটে আসতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েও বাহাদুর তাকে বাধা দিল না এবং কুকুরেরাও যেমন খেলছিল তেমনিই ছোটাছুটি করে খেলতে লাগল। একটা ঘেউ পর্যন্ত করল না।

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

লোকটার চেহারা ভদ্রলোকের মতোই, মুখখানায় একটা ভালোমানুষিও আছে, তবে পোশাকটা একটু কেমন কেমন, মিস্তিরি বা ফিটাররা যেমন তেলকালি লাগার ভয়ে ওভারল পরে, অনেকটা সেরকমই একটা জিনিস লোকটার পরনে। পায়ে এই শীতকালেও গামবুট ধরনের জুতো। কারও মাথায় এমন নিখুঁত টাকও সোমনাথবাবু কখনও দেখেননি। লোকটার মাথায় একগাছি চুলও নেই।

বারান্দায় উঠে আসতেই সোমনাথবাবু অত্যন্ত কঠোর গলায় বলে উঠলেন, 'কী চাই? কার হুকুমে এ বাড়িতে ঢুকেছেন?'

লোকটা জবাবে পালটা একটা প্রশ্ন করল, 'আপনি কি সকালের জলখাবার সমাধা করেছেন?'

সোমনাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, 'না, তো-ইয়ে-মানে আপনি কে বলুন তো?'

লোকটা মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'আমার, খুবই খিদে পেয়েছে। হাতে বিশেষ সময়ও নেই।'

লোকটার বাঁ-কবজিতে একটা অদ্ভুত দর্শন ঘড়ি। বেশ বড়ো এবং ডায়ালে বেশ জটিল সব ছোটো ছোটো ডায়াল ও কাঁটা রয়েছে।

সোমনাথবাবু একটা গলা খাঁকারি দিয়ে রাগটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'দেখুন, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। অচেনা বাড়িতে ফস করে ঢুকে পড়া মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়। তার উপর বিনা নিমন্ত্রণে খেতে চাইছেন এটাই বা কেমন কথা?'

লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'আপনার খিদে পেলে আপনি কী করেন?'

'আমি! আমি খিদে পেলে খাই, কিন্তু সেটা আমার নিজের বাড়িতে।'

'আমিও খিদে পেলে খাই।' এই বলে লোকটা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সোমনাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি নিজের বাড়িতে গিয়ে খান না।'

লোকটা হাসি হাসি মুখ করেই বললেন, 'আমার নিজের বাড়ি একটু দূরে। আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এখানে একটু আটকে পড়েছি।'

সোমনাথবাবু বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে বললেন, ‘আপনি আমার দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে কুকুরগুলোর চোখ এড়িয়ে কী করে ঢুকলেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে কোনো লোক কখনও খবর না-দিয়ে ঢুকতে পারে না।’
লোকটা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে, ‘সে-কথা ঠিকই, আপনার দারোয়ান বা কুকুরেরা কেউই খারাপ নয়। ওদের ওপর রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনার কি সকালের দিকে খিদে পায় না? খেতে খেতে বরং দু-চারটে কথা বলা যেত।’
এই বলে লোকটা এমন ছেলেমানুষের মতো সোমনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে সোমনাথবাবু হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, ‘আপনি একটু অদ্ভুত আছেন মশাই, আচ্ছা, ঠিক আছে, জলখাবার খাওয়াচ্ছি একটু বসুন।’
সোমনাথবাবু উঠে ভিতর বাড়িতে এসে রান্নার ঠাকুরকে জলখাবার দিতে বলে বারান্দায় ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তাঁর ভয়ংকর সাত-সাতটা কুকুর বারান্দায় উঠে এসে বেঁটে লোকটার চারধারে একেবারে ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর লোকটা খুব নিম্নস্বরে তাদের কিছু বলছে।
সোমনাথবাবুকে দেখে লোকটা যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, ‘এই একটু এদের সঙ্গে কথা বললুম আর কী। ওই যে জিমি কুকুরটা, ওর কিন্তু মাঝে মাঝে পেটে ব্যাথা হয়, একটু চিকিৎসা করাবেন। আর টমি বলে ওই যে অ্যালসেশিয়ানটা আছে, ও কিন্তু একটু অপ্রকৃতিস্থ, সাবধান থাকবেন।’
সোমনাথবাবু এও বিস্মিত যে মুখে প্রথমটায় কথা সরল না। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে যখন কথা বলতে পারলেন তখন গলায় ভালো করে স্বর ফুটছে না, ‘আপনি ওদের কথা বুঝতে পারেন? ভাবই বা হল কী করে?’
লোকটাও যেন একটু অবাক হয়ে বলে, ‘আপনি কুকুর পোষেন অথচ তাদের ভাষা বা মনের ভাব বোঝেন না এটাই বা কেমন কথা? ওরা তো আপনার কথা দিব্যি বোঝে। দু-পায়ে দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বললে নিয়ে আসে। তাই না? ওরা যা পারে আপনি তা পারেন না কেন?’
সোমনাথবাবুকে স্বীকার করতে হল যে কথাটায় যুক্তি আছে। তারপর বললেন, ‘কিন্তু ভাব করলেন কী করে?’
‘ওরা বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে!’ সোমনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, ‘কিন্তু বাহাদুর! বাহাদুর তো আমার মতোই মানুষ। তার ওপর ভীষণ সাবধানি লোক। তাকে হাত করা তো সোজা নয়।’
লোকটা মিটিমিটি হেসে বলে, ‘আমি যখন ঢুকছিলাম তখন বাহাদুর হাসিমুখে আমাকে একটা সেলামও করেছিল। শুধু আপনিই কেমন যেন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারছেন না।’
সোমনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, ‘মানে-ইয়ে যাকগে, আমার এখন আর কোনো বিরূপ ভাব নেই।’
‘আমার কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে।’
শশব্যস্তে সোমনাথবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন।’
লোকটার সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে পরোটা আর আলুর চচ্চড়ি খেল, তারপর গোটা পাঁচেক রসগোল্লাও। চা বা কফি খেল না। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, ‘আর সময় নেই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।’
সোমনাথবাবু ভদ্রতা করে বললেন, ‘আপনি কোথায় থাকেন?’
‘বেশ একটু দূরে। অনেকটা পথ।’
‘গাড়িটা কি মেরামত হয়ে গেছে? নইলে আমি আমার ড্রাইভারকে বলে দেখতে পারি, সে গাড়ির কাজ খানিকটা জানে।’
লোকটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, ‘এ গাড়ি ঠিক আপনাদের গাড়ি নয়। আচ্ছা চলি।’

লোকটা চলে যাওয়ার পর সোমনাথবাবু বাহাদুরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'যে লোকটা একটু আগে এসেছিল তাকে তুই চিনিস! ফস করে ঢুকতে দিলে যে বড়ো !'
বাহাদুর তার ছোটো চোখ দুটো যথাসম্ভব বড়ো বড়ো করে বলল, 'কেউ তো আসেনি বাবু।'
'আলবাত এসেছিল, তুই তাকে সেলামও করেছিস।'
বাহাদুর মাথা নেড়ে বলে, 'না, আমি তো কাউকে সেলাম করিনি। শুধু সাতটার সময় আপনি যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন আপনাকে সেলাম করেছি।'
সোমনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আমি! আমি সকালে আজ বাইরেই যাইনি তা ঢুকলুম কখন? ওই বেঁটে বিচ্ছিরি টেকো লোকটাকে তোর আমি বলে ভুল হল নাকি?'
সোমনাথবাবু তাঁর কুকুরদের ডাকলেন এবং একতরফা খুব শাসন করলেন, 'নেমকহারাম, বজ্জাত, তোরা এতকালের ট্রেনিং ভুলে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়িতে ঢুকতে দিলি! টুঁ শব্দটিও করলি না!'
কুকুররা খুবই অবোধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।
মাসখানেক কেটে গেছে। বেঁটে লোকটার কথা একরকম ভুলেই গেছেন সোমনাথবাবু। সকালবেলায় তিনি বাগানের গাছগাছালির পরিচর্যা করছিলেন। তাঁর সাতটা কুকুর দৌড়ঝাঁপ করছে বাগানে। ফটকে সদাসতর্ক বাহাদুর পাহারা দিচ্ছে। শীতের রোদ সবে তেজী হয়ে উঠতে লেগেছে।
একটা মোলায়েম গলাখাঁকারি শুনে সোমনাথবাবু ফিরে তাকিয়ে অবাক। সেই লোকটা। মুখে একটু ক্যাবলা হাসি।
সোমনাথবাবু লোকটাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ, আজও দেখছেন বাহাদুর লোকটাকে আটকায়নি এবং কুকুরেরাও নির্বিকার। সোমনাথবাবু নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'এই যে! কী খবর?'
'আজ্ঞে খবর শুভ। আজও আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।'
'তার মানে আজও কি আপনার গাড়ি খারাপ হয়েছে?'
'হ্যাঁ। দূরের পাল্লায় চলাচল করতে হয়, গাড়ির আর দোষ কী?'
'তা বলে আমার বাড়িটাকে হোটেলখানা বানানো কি উচিত হচ্ছে? আর আপনার গতিবিধিও রীতিমতো সন্দেহজনক। আপনি এলে দারোয়ান ভুল দেখে, কুকুরেরাও ভুল বোঝে। ব্যাপারটা আমার সুবিধের ঠেকছে না।'
লোকটা যেন বিশেষ লজ্জিত হয়ে বলে, 'আমাকে দেখতে হুবহু আপনার মতোই কিনা, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।'
সোমনাথবাবু একথা শুনে একেবারে বুরবক, 'তার মানে? আমাকে দেখতে আপনার মতো! আমি কি বেঁটে? আমার মাথায় কি টাক আছে?'
লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, 'না না, তা নয়। আপনি আমার চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা, আপনার হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আপনার মাথায় দু-লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশো পঁচিশটা চুল আছে। আপনি দেখতেও অনেক সুদর্শন। তবু কোথায় যেন হুবহু মিলও আছে।'
উত্তেজিত সোমনাথবাবু বেশ ধমকের গলায় বললেন, 'কোথায় মিল মশাই? কীসের মিল?'
লোকটা একটা রুমালে টাকটা মুছে নিয়ে বলল, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে। এখন হাতে সময় নেই। আমার বড়ো খিদে পেয়েছে।'
সোমনাথবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'খিদে পেয়েছে 'তো হোটেলে গেলেই হয়।'
লোকটা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই যে!'
'পয়সা নেই! এদিকে তো দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করেন। তাহলে পয়সা নেই কেন?'
লোকটা কাঁচুমাচু মুখে পকেটে হাত দিয়ে একটা কাঠি বের করে বলল, 'এ জিনিস এখানে চলবে?'
'তার মানে?'

'আমাদের দেশে এগুলোই হচ্ছে বিনিময় মুদ্রা। এই যে কাঠির মতো জিনিসটা দেখছেন এটার দাম এখানকার দেড়শো টাকার কাছাকাছি। কিন্তু কে দাম দেবে বলুন!'
সোমনাথবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কাঠি! কাঠি আবার কোথাকার বিনিময় মুদ্রা হল? এসব তো হেঁয়ালি ঠেকছে।'
লোকটা একটু কাতর মুখে বলল, 'সব কথারই জবাব দেব। আগে কিছু খেতে দিন। বড্ড খিদে।'
সোমনাথবাবু রুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি লোকটাকে খাওয়ালেনও। লোকটা যখন গোগ্রাসে পরোটা খাচ্ছে তখন সোমনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনার নাম বা ঠিকানা কিছুই তো বলেননি, কী নাম আপনার?'
লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'নামটা শুনবেন! একটু অদ্ভুত নাম কিনা, আমার নাম খ।'
সোমনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'শুধু খ! এরকম নাম হয় নাকি?'
'আমাদের ওখানে হয়।'
'আর পদবী?'
'খ মানেই নাম আর পদবী। খ হল নাম আর অ হল পদবী। দুয়ে মিলেই ওই খ।'
'ও বাবা! এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার।'
'আমাদের সবই ওরকম।'
'তা আপনার বাড়ি কোথায়?'
'একটু দূরে। সাড়ে তিনশো আল হবে।'
'আল! আল আবার কী জিনিস?'
'ওটা হল দূরত্বের মাপ।'
'এরকম মাপের নাম জন্মে শুনিনি মশাই। তা আল মানে কত? মাইল খানেক হবে নাকি?'
লোকটা হাসল, 'একটু বেশি। হাতে সময় থাকলে চলুন না, আমার গাড়িটায় চড়ে আলের মাপটা দেখে আসবেন।'
'না না, থাক।'
লোকটা অভিমানী মুখে বলে, 'আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছেন না! আমি কিন্তু ভালো লোক। মাঝে মাঝে খিদে পায় বলে হামলা করি বটে, কিন্তু আমার কোনো বদ মতলব নেই।'
সোমনাথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আরে না না। ঠিক আছে, বলছেন যখন যাচ্ছি। তবে এসময়ে আমি একটু ব্যস্ত আছি কিনা, বেশি সময় দিতে পারব না।'
'তাই হবে চলুন, গাড়িটা পিছনের মাঠে রেখেছি।'
'মাঠে! ও তো ঠিক মাঠ নয়, জলা জায়গা, ওখানে গাড়ি রাখা অসম্ভব।'
'আমার গাড়ি সর্বত্র যেতে পারে। আসুন না দেখবেন।'
কৌতূহলী সোমনাথবাবু লোকটার সঙ্গে এসে জলার ধারে পৌঁছে অবাক। কোথাও কিছু নেই।
'কোথায় আপনার গাড়ি মশাই?' বলে পাশে তাকিয়ে দেখেন লোকটাও নেই। সোমনাথবাবু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন।
অবশ্য বিস্ময়ের তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। ফাঁকা মাঠ, লোকটাও হাওয়া দেখে সোমনাথবাবু ফিরবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় অদৃশ্য থেকে লোকটা বলে উঠল, 'আহা, যাবেন না, একটা মিনিট অপেক্ষা করুন।'
বলতে বলতেই সামনে নৈবেদ্যর আকারের একটা জিনিস ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। বেশ বড়ো জিনিস, একখানা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ির সমান। নীচের দিকটা গোল, ওপরের দিকটা সরু।
'এটা আবার কী জিনিস?'

নৈবেদ্যর গায়ে পটাং করে একটা চৌকো দরজা খুলে গেল আর নেমে এল একখানা সিঁড়ি। লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আসুন আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক।'
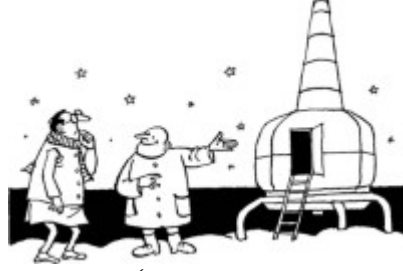
লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আসুন আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক ।'

সোমনাথবাবু এমন বিস্মিত হয়েছেন যে, কথাই বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় তোতলাতে লাগলেন, 'ভূ-ভূত! ভূ-ভূতুড়ে!...'

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, 'না মশাই না। ভূতুড়ে নয়। গাড়িটা অদৃশ্য করে না-রাখলে যে লোকের নজরে পড়বে। আসুন, চলে আসুন। কোনো ভয় নেই।'

সোমনাথবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও বাবা, আপনি তো সাংঘাতিক লোক! আমি ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। আপনি যান, আমি যাব না।'

লোকটা করুণ মুখে বলে 'কিন্তু আমি তো খারাপ লোক নই সোমনাথবাবু।'

সোমনাথবাবু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, 'খারাপ নন, তবে ভয়ংকর। আপনি গ্রহান্তরের লোক।'

'আজ্ঞে, আপনাদের হিসেবে মাত্র দু-হাজার লাইট ইয়ার দূরে আমার গ্রহ। বেশ বড়ো গ্রহ। আমাদের সূর্যের নাম সোনা। সোনার চারদিকে দেড় হাজার ছোটো-বড়ো গ্রহ আছে। সব ক-টা গ্রহই বাসযোগ্য। আপনাদের মতো মোটে একটা গ্রহে প্রাণী নয় সেখানে। সব ক-টা গ্রহেই নানা প্রাণী আর উদ্ভিদ। কোনো কোনো গ্রহে এখন প্রস্তরযুগ চলছে, কোনোটায় চলছে ডায়নোসরদের যুগ, কোথাও বা সভ্যতা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কোনো গ্রহে ঘোর কলি, কোনোটাতে সত্য, কোনোটাতে ত্রেতা, কোথাও বা দ্বাপর—সে এক ভারি মজার ব্যাপার। বেশি সময় লাগবে না, এ গাড়ি আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।'

'ওরে বাবারে!' বলে সোমনাথবাবু প্রাণপণে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু পারলেন না। একটা সাঁড়াশির মতো যন্ত্র পট করে এগিয়ে এসে তাকে খপ করে ধরে সাঁ করে তুলে নিল সেই নৈবেদ্যর মধ্যে।

তারপর একটা ঝাঁকুনি আর তারপর একটা দুলুনি। সোমনাথবাবুর একটু মূর্ছার মতো হল। যখন চোখ চাইলেন তখন দেখেন নৈবেদ্যটা এক জায়গায় থেমেছে। দরজা খোলা। লোকটা একগাল হেসে বলল, 'আসুন, ডায়নোসর দেখবেন না! ওই যে।'

দরজার কাছে গিয়ে সোমনাথবাবুর আবার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। ছবিতে যেমন দেখেছেন হুবহু তেমনি দেখতে গোটা দশেক ডায়নোসর বিশাল পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আকাশে উড়ছে বিশাল টেরোড্যাকটিল এবং অন্যান্য বিকট পাখি।

ভয়ে চোখ বুজলেন সোমনাথ। আবার দুলুনি। এবার যেখানে যান থামল সেখানে সব চামড়া আর গাছের ছালের নেংটি পরা মানুষ পাথর ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করছে। মহাকাশযান দেখে তারা অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল।

দু-চারটে তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো এসে লাগলও মহাকাশযানের গায়ে। লোকটা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে তার গাড়ি ছেড়ে দিল।
এবারের গ্রহটা রীতিমতো ভালো। দেখা গেল রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণভাই শিকার করতে বেরিয়েছেন। দুজনেই খুব হাসছেন। রামচন্দ্রকে জোড়হাতে প্রণাম করলেন সোমনাথবাবু। রামচন্দ্র বরাভয় দেখিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।
সোমনাথবাবু ঘামতে ঘামতে বললেন, 'এসব কি সত্যি? না স্বপ্ন দেখছি?'
'সব সত্যি। আরও আছে।'
'আমি আর দেখব না। যথেষ্ট হয়েছে। মশাই, পায়ে পড়ি, বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।'
লোকটা বিনীতভাবে বলল, 'যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবেন। আরও কত কী দেখার আছে।'
মহাকাশযানটা ফের শূন্যে উঠল। সেই দুলুনি। কিছুক্ষণ পর জলার মাঠে নেমে পড়তেই সোমনাথবাবু প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'দাদা, একটু মনে রাখবেন আমাকে, মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে এসে পড়লে পরোটা-টরোটা যেন পাই।'
'হবে, হবে।' বলতে বলতে সোমনাথবাবু বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

সময় সরণী

'আচ্ছা, এটা কি সুধীরবাবুর বাড়ি?'
'হ্যাঁ, আমিই সুধীর ভটচায। আপনি কে বলুন তো?'
'আমাকে ঠিক চিনবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আসা। ভিতরে আসতে পারি কি?'
'আসুন।'
'এখানে বোধহয় দরজার বাইরে চটি ছেড়ে ঢোকার নিয়ম, তাই না?'
'তা নিয়ম একটা আছে বটে, যদি আপনার অসুবিধে না-হয়, তাহলে—'
'না, না, ঠিক আছে। চটি ছেড়েই আসছি।'
'আসুন, বসুন।'
'আপনাদের এ জায়গাটা বেশ গরম।'
'তা তো বটেই। গ্রীষ্মকালে এ দেশে গরম পড়ে। আপনি কি এদেশে থাকেন না?'
'না, না, আমিও এদেশেই থাকি। মাত্র কয়েক মাইল তফাতে। তবে আমাদের ওখানে বিশেষ গরম নেই।'
'কয়েক মাইলের তফাতে তো আর দার্জিলিং পাহাড় নয় মশাই।'
'না, না, অত দূরের কথা বলছি না। আমি শ্যামবাজারের দিকটায় থাকি।'
'তা শ্যামবাজারে গরমের অভাব কি? কালও তো হাতিবাগানে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছি। আপনি বোধহয় এয়ার কণ্ডিশনে থাকেন।'
'খানিকটা তাই।'
'তাই বলুন।'
'তবে সেটা ন্যাচারাল এয়ার কণ্ডিশনিং।'
'সেটা আবার কীরকম?'
'এমন সব গাছ আছে যা কুলিং সিস্টেমের কাজ করে।'
'গাছ! শ্যামবাজারে আবার গাছ কোথায় পেলেন?'
'সে কথা থাক। আগে জরুরি কথাটা সেরে নিই।'
'হ্যাঁ বলুন।'
'এখন ঘড়িতে বাজছে সকাল ন-টা। ঠিক তো।'
'হ্যাঁ ¡। কাঁটায় কাঁটায়।'
'ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এবাড়িতে একটা ঘটনা ঘটবে। আর সেইজন্যই আমার আসা।'
'ঘটনা! কী ঘটনা বলুন তো! দিনে-দুপুরে ডাকাত পড়বে নাকি?'
'না, না। অত বড়ো ঘটনা নয়। খুবই তুচ্ছ একটা ঘটনা, কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর।'
'আপনি কি জ্যোতিষী?'
'আজ্ঞে না। তবে আমি লজিক্যাল।'
'তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি কি পাগল?'
দাঁড়ান, আমার কথাগুলো একটু হেঁয়ালির মতো হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আসলে এখনকার বাংলা ভাষায় কথা বলতে তেমন অভ্যস্ত নই তো, তাই।

'আপনি কি বাঙালি নন?'

'বাঙালিই, তবে একটু অন্যরকম বাঙালি। আমাদের বাংলাটা একটু অন্যরকম।'

'তা হতেই পারে। শুনেছি চট্টগ্রাম বা সিলেটের বাংলা বেশ অন্যরকম।'

'প্রবলেমটা অনেকটা সেরকমই। যাই হোক, একটু বুঝিয়ে বলছি।'

'বলুন।'

'আপনার ছেলের নাম কিংশুক ভট্টাচার্য তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তাকে চিনলেন কী করে?'

'তিনি আমার দাদু।'

'দাদু! বলেন কী মশাই! আপনার মাথায় তো বেশ গন্ডগোল! আমার ছেলের বয়স মাত্র আট মাস। আর কিংশুক নামটাই যে শেষ অবধি রাখা হবে তারও ঠিক নেই।'

'প্লিজ। দয়া করে ওঁর নাম কিংশুকই রাখবেন। দু-হাজার বাষট্টি সালে কিংশুক ভট্টাচার্য নামেই উনি নোবেল প্রাইজ পাবেন। নাম পালটালে অনেক গন্ডগোল হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মশাই, আপনি এখন আসুন। আমার অনেক কাজ আছে।'

'ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই। আমি সত্যিই কিংশুক ভট্টাচার্যের নাতি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবেন।'

'আপনি কি টাইম মেশিনের গপ্পো ফাঁদবেন? ভবিষ্যৎ থেকে উড়ে এসেছেন! ওসব গুলগল্প আমাদের ঢের জানা আছে।'

'আমরা ঘনাদার গল্প অনেক পড়েছি। স্টিফেন হকিং বলেই দিয়েছেন টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। মিচকি মিচকি হাসছেন যে !'

'স্টিফেন হকিং তো আর সব সত্যের সন্ধান জানতেন না, অধিকাংশ সত্যই হল আপেক্ষিক। এক-এক দেশে এক-এক সময়ে এক-এক পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এক-একটা জিনিসকে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। আমি সত্যিই সময়ের সরণি বেয়ে এসেছি। আমি সম্পর্কে আপনার ছেলে কিংশুকের নাতি, আপনার পুতি।'

'হাঁ: হাঁ:, মশাই, বেড়ে গল্প ফেঁদেছেন। আসল কথাটা কী বলুন তো!'

'সেই কথা বলতেই আসা। নইলে আমরা সহজে টাইম ট্রাভেল করি না, তাতে অনেক রকম বিপত্তি হয়। যা বলছি দয়া করে শুনুন। বেলা দশটা কুড়ি মিনিট নাগাদ আপনার বন্ধু বঙ্কুবিহারী আর অরূপ মাইতি আসবেন। দশটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ আপনার স্ত্রী তাঁদের দুজনকে দুটি করে সিঙাড়া পরিবেশন করবেন। সিঙাড়াগুলো আপনি গতকালই একটি মাড়োয়ারি দোকান থেকে কিনে এনেছেন, কিন্তু অত্যধিক ঝাল বলে খেতে পারেননি, ফ্রিজে রেখে দেওয়া আছে। আপনার স্ত্রী সেগুলোই মাইক্রো ওয়েভে গরম করে দেবেন। দশটা বত্রিশ নাগাদ অরূপ ও বঙ্কুবিহারী ঝালে হাঁসফাঁস করতে করতে ঠাণ্ডা জল চাইবেন। আপনার স্ত্রী ফ্রিজের জল নিয়ে এ ঘরে আসবার উপক্রম করবেন। আর তখনই ঘটনাটা ঘটবে। আপনি ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?'

'একটু অবাক হচ্ছি। সিঙাড়ার ঘটনাটা সত্যি। বাকিগুলো সত্যি কিনা—'

'সত্যি। একটু বাদেই বুঝবেন।'

'আচ্ছা বেশ। কিন্তু ঘটনাটা কী?'

'আপনার স্ত্রীর হাত থেকে একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে ভাঙবে এবং গেলাসের জল পড়ে পিছল মেঝেতে আপনার স্ত্রী আছাড় খেয়ে পড়ে ফিমার বোন ভাঙবে।'

'সর্বনাশ!'

'আরও সর্বনাশ হল ফিমার বোন ভেঙে আপনার স্ত্রী শেষ অবধি পঙ্গু হয়ে যাবেন এবং তার ফলে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না।'

‘চিনাংশুক! সে কে ?’

‘কিংশুকের ছোটো ভাই।’

‘বলেন কী?’

‘যা বলছি দয়া করে শুনুন। চিনাংশুক না-জন্মালে খুবই গন্ডগোল হয়ে যাবে।’

‘দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। আপনি নিজে তো পাগল বটেই, কিন্তু আপনার পাগলামির চোটে যে আমারও পাগল হওয়ার জোগাড়! কী সব আবোল-তাবোল বকছেন?’

‘রেগে যাবেন না, মাথা ঠাণ্ডা করুন। সমস্যাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।’

‘সমস্যাটা কী?’

‘সমস্যা হচ্ছে এক গেলাস জল। ওই এক গেলাস জলই ভাবী কালের ইতিহাস পালটে দিতে পারে। আর সেইজন্যই আমার আসা।’

‘আপনার গুলগল্পে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আসুন এখন।’

‘আপনার যাতে বিশ্বাস হয় সেইজন্য দু-হাজার বাষট্টি সালের একটি খবরের কাগজ আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এটি অবশ্য আপনাদের সংবাদপত্রের মতো নিউজপ্রিন্টে ছাপা নয়, এটি ছাপা হয়েছে সিনথেটিক পেপারে। এই যে ফ্রন্ট পেজে বড়ো হেডিং-এ খবরটা দেখুন।’

‘ও বাবা! এ তো দেখছি কিংশুক ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যায় সত্যিই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে! এটা জালি ব্যাপার নয় তো?’

‘ওই খবরের কাগজটা যে মেটেরিয়ালে ছাপা হয়েছে তা আপনি কখনও দেখেছেন?’

‘না মশাই! এ তো ভারি নরম অথচ মোলায়েম জিনিস। আর ছাপাও তো দারুণ সুন্দর। কিন্তু ভাষাটা একটু যেন কেমন কেমন। সব বাক্য ভালো বোঝা যাচ্ছে না।’

‘ভাষা এক নিরন্তর পরিবর্তনশীল জিনিস। আমাদের আমলে ভাষা অনেক সংকেতময় হয়েছে।’

‘তাই দেখছি।’

‘এখন কি একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে?’

‘আমি ধাঁধায় পড়ে গেছি। তা আপনি যদি টাইম ট্রাভেলার হয়েই থাকেন তাহলে আপনার গাড়ি কই?’

‘টাইম ট্রাভেল করতে গাড়ি লাগে নাকি?’

‘সিনেমায়-টিনেমায় তাই তো দেখি।’

‘ও তো আজগুবি ব্যাপার। তবে গাড়ি না-হলেও একটা শ্যাফট বা লম্বা নলের মতো জিনিস আছে। ওর টেকনোলজি আপনি ঠিক বুঝবেন না। তবে শ্যাফটটাও আপনার বাড়ির সামনের ওই খেলার মাঠটায় রয়েছে। ওটা দেখতে পাবেন না, কারণ ওটা ওখানে রয়েছে রাত তিনটের স্লটে। দিনেদুপুরে শ্যাফটটা দেখতে পেলে লোকের অনাবশ্যক কৌতূহল হবে।’

‘যাকগে, এখন খোলসা করে বলুন ব্যাপারটা কী।’

‘ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল, সময়ের শরীরে মাঝে মাঝে এক-আধটা কুঞ্চন দেখা দেয়। ওই কুঞ্চনের ফলে অনেক সময়ে পরবর্তী ঘটনাবলিতে প্রভাব পড়ে। আমরা তেমন বিপজ্জনক কুঞ্চন দেখলে সেটাকে একটু মসৃণ করে দিই মাত্র। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিংশুক ভট্টাচার্য দু-হাজার বাষট্টি সালে যে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পাবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার স্ত্রীর যদি আজ ফিমার বোন ভাঙে এবং চিনাংশুক না-জন্মায় তাহলে কিংশুক ভট্টাচার্য সেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করতে পারবেন না।’

‘কেন মশাই?’

‘তার কারণ কিংশুক একমাত্র সন্তান হলে তাকে আপনারা অত্যধিক আদর দেবেন এবং অতিআদরে সে অলস অপদার্থ এবং বখাটে হয়ে যাবে। ফলে তার পক্ষে আর আবিষ্কারটা সম্ভব হবে না। চিনাংশুক জন্মালে কিন্তু আপনাদের মনোযোগ সে অনেকটাই কেড়ে নেবে এবং কিংশুক ভট্টাচার্যও অ্যাকটিভ থাকবেন।’

‘বটে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার।’
‘হ্যাঁ। কিন্তু দশটা পনেরো বাজে। প্রস্তুত হোন।’
‘কী করতে হবে মশাই?’
‘আপনি কিছুই করবেন না। শুধু আপনার স্ত্রী যখন জলটা আনবেন তখন উঠে গিয়ে আপনি ওঁর হাত থেকে গেলাস দুটো নিয়ে নেবেন। টাইমিংটা কিন্তু খুব জরুরি। এক সেকেণ্ড আগে বা পরে হলেই ব্যাপারটা কেঁচে যাবে।’
‘বুঝেছি।’
‘খুব সাবধান। ওই ডোরবেল বাজছে, আপনার বন্ধুরা এসেছেন।’
‘দরজা কি খুলে দেব?’
‘দিন। আমার নাম অশঙ্ক ভট্টাচার্য। আমাকে আপনার দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে পারেন বন্ধুদের কাছে।’
‘তাই হবে। বলে গিয়ে সুধীরবাবু দরজা খুলে দেখলেন সত্যিই বঙ্কু আর অরূপ এসেছে।’
‘তার পরের ঘটনাগুলো ঠিক যেমনটি অশঙ্ক বলেছিল তেমনই ঘটতে লাগল। ঝাল সিঙাড়া খেয়ে দুজনেই বলে উঠল, বউদি, ঠাণ্ডা জল দিন।’
অশঙ্ক চোখের ইশারা করে সুধীরবাবুকে বলল, ‘এইবার! খুব সাবধান কিন্তু —’
সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং তাঁর স্ত্রী যখন ফ্রিজের বোতল বের করে গেলাসে জল ঢালছেন তখনই গিয়ে বললেন, ‘দাও গেলাস দুটো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।’
‘তুমি! তুমি নেবে কেন?’
‘আহা, দাও না। তুমি পড়ে-টড়ে গেলে যে সর্বনাশ!’
‘পড়ব! আমি পড়ব কেন?’
‘পড়ারই কথা কিনা। আর তুমি পড়লে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না। তাহলে যে সর্বনাশ।’
‘বলি সকালেই কি গাঁজা টেনেছ নাকি? কী সব বাজে বকছ! সরো, জল আমি নিয়ে যাচ্ছি।’
‘আহা-হা, করো কী, করো কী!’

সুধীরবাবুর মুখে অবশ্য হাসি...

বলে সুধীরবাবু তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে গেলাস দুটো একরকম কেড়েই নিতে গেলেন। আর টানা-হ্যাঁচড়ায় একটা গেলাস হাত ফসকে পড়ে শতখান হয়ে ভাঙল। এবং স্ত্রী নয়, সুধীরবাবু নিজেই পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলেন।

স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন। বন্ধুরা ছুটে এল। সঙ্গে অশঙ্কও। ধরাধরি করে তোলা হল তাঁকে। বাঁ-হাতটায় প্রচন্ড লেগেছে।
বন্ধু ডাক্তার। হাতটা ভালো করে দেখে বলল, ‘কনুইয়ের কাছটা তো ফ্র্যাকচার হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ভোগাবে।’
সুধীরবাবুর মুখে অবশ্য হাসি। অশঙ্কের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, ‘কী হে বাপু, কেমন সামলে দিয়েছি?’
অশঙ্ক মৃদু হেসে বলল, ‘হ্যাঁ, সময়ের যে কুঞ্চনটা ছিল সেটা এখন সটান হয়ে গেছে।’

মাসির বাড়ি

নবাবগঞ্জে পৌঁছে সে শুনল, মাদলপুরের শেষ বাস সন্ধেবেলা ছেড়ে গিয়েছে। রাতে ওদিকে যাওয়ার যানবাহন বলতে কিছু নেই।
শুনে অগাধ জলে পড়ল গয়ারাম। ট্রেনটা তিন ঘণ্টা লেট না-করলে এতক্ষণে তার মাসির বাড়িতে পৌঁছে বিকেলের ফলার সেরে ওঠার কথা। খিদেও বড়ো কম পায়নি। মাত্র বাইশ বছর বয়স। গোবিন্দপুর গাঁ থেকে টানা তিন মাইল হেঁটে এসে ট্রেন খারাপ। রাস্তায় একটু বাদামভাজা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। পয়সা বেশি নেইও সঙ্গে। রাস্তায় চোরে-ডাকাতে কেড়ে নেবে বলে মা রাস্তা খরচটুকু ছাড়া আর মাত্র পাঁচটা টাকা দিয়েছেন। অবশ্য মাসির বাড়ি পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু পৌঁছোনো নিয়েই চিন্তা।
তার মাসতুতো দাদা কালীশঙ্করের বিয়ে। কাল ভোরবেলা বরযাত্রীরা বর নিয়ে রওনা হয়ে যাবে। কালীদার ভাবী শ্বশুরবাড়ি নাকি একবেলার পথ। খানিকটা নৌকোয় গিয়ে তারপর হাঁটাপথ। অবশ্য বরযাত্রীদের জন্য গোরুরগাড়ি আর বরের পালকিও থাকবে। আর বরযাত্রী যাওয়ার জন্যই তাড়াহুড়ো করে আসা। মাসি পইপই করে আসার জন্য চিঠি লিখেছেন।
কিন্তু গয়ারাম এখন করে কী?
নবাবগঞ্জ জায়গা মন্দ নয়, দোকান-বাজার আছে, স্টেশন আছে, পোস্ট অফিস আছে। মাদলপুর অবশ্য নিকষ্যি গাঁ। নবাবগঞ্জ আর মাদলপুরের মাঝখানে একখান পেল্লায় জলা-জমি আছে। লোকে বলে পেতনির জলা। ভূতপ্রেতের কথা ছেড়ে দিলেও, এই শীতে সন্ধের পর রোজই বাঘ বের হয়। কমলপুরের জঙ্গল থেকে বুনো কুকুরের ঝাঁকও কখনো কখনো হানা দেয়। তারা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।
বাজারের প্রান্তে অশ্বত্থ গাছটার তলায় বাঁধানো চাতালে বসে যখন গয়ারাম সাত-পাঁচ ভাবছে, তখনই হঠাৎ টের পেল, চাতালের ওদিকটায় অন্ধকারে বসে দুটো লোক গভীর শলাপরামর্শ করে যাচ্ছে। দু-একবার 'গুণময় রায়' আর 'মাদলপুর' শব্দ দুটো কানে এল। সে একটু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।
একজন বলল, 'শোন পচা, বুক ঠুকে কাজটা করে ফেলতে পারলে আমার আর চিন্তা নেই। ধর, যদি গয়না বেচে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাই, তাহলে দুজনে মিলে নবাবগঞ্জে মনোহারী দোকান দেব। কথা দিচ্ছি, আর জীবনে চুরি-জোচ্চোরি করব না, এই একবারটি ছাড়া।'
'দ্যাখ গদা, আমি জীবনে কখনও ওসব করিনি, ওসব করলে ভগবান পাপ দেয়।'
'আহা, বলছি তো, এবারকার মতো পাপটা করে ফেলে একটা প্রায়শ্চিত্তির করে নিলেই হবে। ওরে, ভগবান তো পাপীদের জন্যই আসেন। তাই তো বলে 'পতিতপাবন'।'
'যদি ধরা পড়ে যাই?'
'সে ভয় নেই। বিয়েবাড়ি বলে কথা! লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। ডেকরেটরের লোক, জেনারেটরের লোক, না-হয় তো রান্নার জোগালি, যা হোক একটা ভেক ধরে নিলেই হবে। চার মাইল তো মোটে রাস্তা। টুক করে কাজ সেরে ফিরে আসব।'
এরা তার মাসির বাড়িতে চুরি করার মতলব আঁটছে দেখে গয়ারাম খুশিই হল। এলাকার ছেলে, সুতরাং পথঘাট চেনে, তা ছাড়া পথের সাথিও পাওয়া যাবে।
গয়ারাম একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'ভায়ারা, একটু আনাড়ি মনে হচ্ছে।'
ছোকরা দুজন তার দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'তুমি কে?'

গয়ারাম হাতে হাত ঘষে বলল, 'দাশরথী পয়মালের নাম জানা আছে?'
পচা আর গদা তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার দু-পাশে জেঁকে বসে বলল, 'না ভাই, তিনি কে?'
'এ লাইনে তিনিই শেষ কথা! অত বড়ো গুণী আর এ লাইনে নেই। কুঞ্জপুরের কাছে থাকেন, একেবারে সাধুসন্তের মতো জীবন! পাপের টাকা ভোগ করেন না, বিলিয়ে দেন। তাঁর ছেলেরা অবশ্য ওই কর্ম করেই খাচ্ছে।'
পচা বলল, 'বটে! কিন্তু ভাই, তুমি তো এ তল্লাটের লোক নও। কী মতলবে উদয় হয়েছ?'
'আমাদের কি তল্লাট বলে কিছু আছে? পেটের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবে দাশরথী পয়মালের চেলা তো, পেটে বিদ্যেটা আছে বলে অসুবিধে হয় না।'
গদা খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলল, 'এই তোমার মতোই একজন সঙ্গীকে আমরা খুঁজছি। আজ রাতে মাদলপুরের এক বিয়েবাড়িতে একটা বড়ো দাঁও আছে। শুনেছি মেলা গয়নাগাটি আর টাকাপয়সার ব্যাপার আছে।'
গয়ারাম খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। ভাবখানা, ছোটোখাটো কাজে তার গা নেই। বলল, 'তা ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে? ছেলের বাড়িতে তো বিশেষ গয়নাগাটি থাকবার কথা নয়। মেয়ের বাড়ি হলেও না-হয় কথা ছিল।'
পচা মাথা চুলকে বলে, 'ছেলের বাড়িই বটে। তবে গুণময় রায় ব্যাংক থেকে পাঁচ লাখ তুলেছে, আর মদন স্যাকরাকে বিস্তর গয়নার বরাত দিয়েছে, এটা পাকা খবর।'
গয়ারাম বলল, 'রাস্তা চেনা আছে? শুনেছি মাদলপুর যেতে বড়ো একটা জলা পড়ে!'
'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। রাতবিরেতে আমাদের ওদিকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়।'
গয়ারাম নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলল, যাক বাবা, চার-পাঁচ মাইল রাস্তা যে এই অন্ধকারে একা ঠ্যাঙাতে হবে না, এটাই যথেষ্ট। গয়ারাম বলে, 'তা না-হয় হল, কিন্তু পেটে যে ছুঁচো ডন মারছে, খালি পেটে কি আর হাত-পা সচল থাকে?'
এবার গদা বলল, 'এই বাজারেই আমার পিসেমশাইয়ের পাইস হোটেল, আমিই এবেলা ম্যানেজারি করেছি। খাওয়ার ভাবনা কী?'
গয়ারাম ফের আরামের শ্বাস ছাড়ল। ভগবান একেবারে ছপ্পড় ফুঁড়ে দিচ্ছেন।
খাওয়াটা মন্দ হল না। ডাল, ভাত আর নিরামিষ তরকারি, সঙ্গে এক বাটি মাংস। চেটেপুটে খেয়ে তিনজন রওনা হয়ে পড়ল।
ভূতনির জলা মাঠ ঘোর অন্ধকার। তবে পচা আর গদা পথঘাট ভালোই চেনে। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তায় ডাঙা জমি দিয়ে দিব্যি যাচ্ছে। পিছনে গয়ারাম।
কিন্তু খানিকটা হাঁটার পরই গয়ারাম শুনতে পেল, অন্ধকারে এই নির্জন পথে তারা ঠিক একা নয়। আশপাশে যেন আরও লোকজন চলেছে এবং তাদের ফিসফাস কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।
গয়ারাম একটু ঠাহর করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল এবং একটু বাদেই শুনতে পেল, হাত দশেক তফাতে বাঁ-ধারে এক বুড়ো মানুষের কাশির শব্দ। তারপরই ঘড়ঘড়ে গলায় কেশো লোকটা কাকে যেন বলল, 'বুঝলি গাব্বু, এই কাশির জন্যই চুরি করা ছাড়তে হয়েছিল আমাকে। চোর কাশলেই সর্বনাশ। অথচ এমন দাঁওটাই কি ছাড়া যায়, বল তো!'
'আহা, তোমার ভিতরে যাওয়ার কী দরকার? তুমি বাইরে বসে কাজের লোকেদের সঙ্গে গপ্পোসপ্পো কোরো। আমি ভিতরে ঢুকে কাজ সেরে আসব। গুণময় রায়ের বাড়ির আনাচকানাচ আমার চেনা।'
গয়ারাম প্রমাদ গুনল, পচা আর গদাই শুধু নয়, আরও নিশিকুটুমরাও তার মাসির বাড়ি যাচ্ছে?
কয়েক কদম এগোতে-না-এগোতে পিছন থেকে কয়েক জোড়া দৌড়-পায়ের আওয়াজ পেল গয়ারাম। তার ডানদিক দিয়ে মাত্র চার-পাঁচ হাত তফাতে গেল কয়েকটা ছোকরা গোছের লোক ছুটে গেল। পিছনের জন একটু উঁচু গলায় বলল 'মাদলপুরের শীতলাতলায় গুণময় রায়ের বাড়ি, বুঝলি তো? ভুল বাড়িতে ঢুকিস না।'

তারা ছুটতে-ছুটতে এগিয়ে গেল।
পচা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা কী হচ্ছে বল তো?'
গয়ারামও অবাক। বলল, 'তাই তো? এরা কারা?'
বুড়োটা পুরোনো চোর কাশী, সঙ্গে ওর নাতি গাব্বু, আর যারা ছুটে গেল, তারা পোড়াগাছতলার নন্দকিশোর সংঘের ছেলে, সব ক-টা চোর।
গদা বলল, 'সর্বনাশ! চল চল, পা চালিয়ে চল।'
পচা বলল, 'দৌড়তে হবে, নইলে পারব না।'
তিনজনে যথেষ্ট বেগে দৌড়োতে লাগল।
আশ্চর্যের বিষয়, দৌড়োতে-দৌড়োতে আরও তিনটে দলকে একে-একে ছাড়িয়ে গেল তারা। কিন্তু চতুর্থ দলটাকে পারল না। হঠাৎ পটাপট ল্যাং মেরে তিনজনকেই ফেলে দিল জনাদশেক চোরের একটা দল।
মুখে টর্চ মেরে একটা লোক বলল, 'অ্যাই খবরদার, আমাদের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করলে লাশ পুঁতে দেব। আমরা গিয়ে আগে চেঁছেঁপুঁছে নিই, তোরা পরে প্রসাদ পাবি।'
তিনজনে চিঁচিঁ করতে লাগল পড়ে থেকে।
ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন তারা মাদলপুরে পৌঁছোল, তখন তাদের দম বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা।
কিন্তু মাদলপুর পৌঁছে তাদের চক্ষু চড়কগাছ। রাত ন-টা বেজে গিয়েছে। এই সময় গাঁ-গঞ্জের লোকের নিশুত রাত। কিন্তু কোথায় কী? গাঁয়ে ঢোকার মুখেই বটতলায় বেশ কয়েকটা হ্যাজাক জ্বলছে। আর সারি-সারি টেবিল-চেয়ার পেতে গাঁয়ের ছেলেছোকরারা বসে কীসের যেন টিকিট বিক্রি করছে। বিভিন্ন টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক লোক টিকিট কাটছে। গয়ারাম অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কীসের লাইন দাদা?'
'ওসব চোরেদের লাইন।'
'কেন, কেন, চোরের আবার লাইন কীসের?'
'আহা, গুণময়বাবুর ছেলের বিয়ে শুনে চারদিক থেকে চোরেরা হাজির হচ্ছিল যে! নানারকম ভেক ধরেই আসছিল। ধরা পড়ে পেটাইও হচ্ছিল। কিন্তু গুণময়বাবুর দয়ার শরীর তো! তাই তিনি বললেন, 'ওরে বাপু, চোরেদেরও তো করে খেতে হবে। চুরি করতে চায় তো চেষ্টা করুক না। তবে বিশৃঙ্খলা যাতে না-হয়, তাও দেখতে হবে। তাই টিকিটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দু-টাকার টিকিট কাটলে চুরি করার জন্য এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। তবে চুরির সময় ধরা পড়লে পাঁচ টাকা ফাইন।'
পচা আর গদা করুণ মুখে বলল, 'আমরা কি পারব? কত বড়ো-বড়ো নামজাদা সব চোরদের দেখতে পাচ্ছি।'
গয়ারাম দমে গিয়ে বলল, 'তাই তো হে!'
অগত্যা টিকিট কেটেই তারা তিনজন গাঁয়ে ঢুকল। গিয়ে দ্যাখে, গুণময়বাবুর বাড়ির সামনেও বেশ লম্বা লাইন। বাড়ি না-বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। পেল্লায় বাগান, দু-মহলা বাড়ি, চারদিকে দাসদাসী, লোকলশকরের অভাব নেই।
চোরেদের সঙ্গে লাইন দিয়ে নিজের মাসির বাড়িতে ঢুকতে গয়ারামের প্রেস্টিজে লাগছিল। কিন্তু উপায় বা কী? সুতরাং পচা আর গদার পিছনে সেও লাইনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।
একটা ছোকরা চোর একটা শসা, একটা পাতিলেবু চুরি করে বেরিয়ে এল। একজন আধবুড়ো লোক একটা পুরোনো গামছা পেয়ে সেটা পতাকার মতো নাড়তে-নাড়তে বিদেয় হল। একজন একটা নারকেল পেয়ে সেটাকেই চুমু খেয়ে সবাইকে হাত উঁচু করে দেখাল। একজন পেয়েছে একমুঠো কাঁচা লঙ্কা, তার মুখখানা ভারি বেজার। বুড়ো চোর শশিপদ এখন চোখেও কম দ্যাখে, কানেও কম শোনে। সে একগাছা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে বিড়বিড় করতে-করতে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বাড়িমুখো রওনা হল। তবে এর মধ্যেই এক ছোকরা

চোর একখানা তাঁতের শাড়ি বগলে নিয়ে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে আসতেই পচা বলল, ‘ওই হচ্ছে পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান চোর, ফটিক।’

কিন্তু গুণময়বাবু তাকে মোটেই পাত্তা না-দিয়ে বললেন,‘অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।’

ঘণ্টাখানেক বাদে তাদের পালা আসতেই তিনজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ি-ঘর-দেয়ালের মধ্যে।
সামনেই মেসোমশাই গুণময় রায়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গয়ারাম তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রণাম করল। কিন্তু গুণময়বাবু তাকে মোটেই পাত্তা না-দিয়ে বললেন, ‘অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।’
‘মেসোমশাই, আমি গয়ারাম।’
‘আয়ারাম গয়ারামদেরই তো দেখছিরে বাবু।’
ভাগ্য ভালো, ঠিক এই সময়েই মাসি কী একটা কাজে মেসোকে ডাকতে এসেছিলেন। গয়ারাম চেঁচিয়ে উঠল, ‘মাসি!’
মাসি হাঁ করে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলেন, ‘মরণ! তুই এই চোরেদের দলে কেনরে মুখপোড়া? তোর চেহারাটাও তো চোর-চোর দেখাচ্ছে। আয় আয়, ঘরে আয় বাবা। মুখখানা একদম শুকিয়ে গিয়েছে।’
পচা আর গদা গয়ারামের কান্ড দেখে হাঁ। পচা বলে উঠল, ‘সে কী হে ভায়া, তুমি চোর নও?’
ভারি লজ্জা পেয়ে গয়ারাম আমতা-আমতা করে বলল, ‘ইচ্ছে যে ছিল না তা নয়। তবে এ যাত্রায় আর হয়ে উঠল না ভায়ারা। তোমরা বরং চেষ্টা দ্যাখো।’
পচা আর গদা ভারি দুঃখিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। গদা বিড়বিড় করে বলল, ‘নেমকহারাম আর কাকে বলে!’

আয়নার মানুষ

শক্তপোক্ত মানুষ হলে কী হয়, গদাধর আসলে বড়ো হা-হয়রান লোক। তিন বিঘে পৈতৃক জমি চাষ করে তার কোনোক্রমে চলে, বাস্তুজমি মোটে বিঘেটাক। তাতে তার বউ শাকপাতা, লাউ-কুমড়ো ফলায়। দুঃখেকষ্টে চলে যাচ্ছিল কোনোক্রমে। কিন্তু পরানবাবুর নজরে পড়েই তার সর্বনাশ।
পরানবাবু ভারি ভুলো মনের মানুষ। জামা পরেন তো ধুতি পরতে ভুলে যান, হাটে পাঠালে মাঠে গিয়ে বসে থাকেন, জ্যাঠামশাইকে 'ছোটোকাকা' ডেকে বিপদে পড়েন। লোকে আদর করে বলে 'পাগলু পরান'। তবে পরানবাবু মাঝে-মাঝে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে ফেলেন। একদিন গুরুপদকে বললেন, 'ওরে সাধুচরণ, চারদিকে চোর। খুব চোখ রাখিস বাপু।'
তা সত্যিই সেই রাতে গুরুপদর বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল।
আর একদিন লক্ষ্মীকান্তকে বলে বসলেন, 'রজনীকান্ত যে! তা বিষ্ণুপুরে বেশ ভালো আছো তো ভায়া।!'
লক্ষ্মীকান্তর বিষ্ণুপুরে যাওয়ার কথাই নয়, যায়ওনি কোনোদিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর কিছুদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরে একটা মাস্টারির চাকরি হয়ে লক্ষ্মীকান্ত চলে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকে বলে গেল, 'পরানবাবু ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।'
অনেকেরই সে কথা বিশ্বাস হল। গাঁয়ের মাতব্বর শশিভূষণ একবার পরানবাবুর খোঁড়া কুকুর ভুলুকে প্রকাশ্যে 'ল্যাংড়া' বলায় খুব রেগে গিয়ে পরানবাবু বলেছিলেন, 'দ্যাখো নিশিবাবু, সব দিন সমান যায় না। ভুলু যদি ল্যাংড়া হয় তো তুমিও ল্যাংড়া।'
অবাক কান্ড হল, দিনসাতেক বাদে শশীবাবু গোয়ালঘরের চালে লাউ কাটতে উঠে একটা সবুজ সাপ দেখে আঁতকে উঠে চাল থেকে পড়ে বাঁ-পায়ের গোড়ালি ভাঙেন। মাসটাক তাঁকে নেংচে-নেংচে চলতে হয়েছিল।
তা সেই পরানবাবু একদিন গদাধরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি যেন কে হে! মুখখানা চেনা-চেনা ঠেকছে!'
'আজ্ঞে, আমি গদাধর লস্কর। চেনা না-ঠেকে উপায় কী বলুন! এই গাঁয়েই জন্মকর্ম, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আপনার বাড়ির বাগান পরিষ্কার করতে কতবার গেছি, মনে নেই? পথেঘাটে হরদম দেখাও হচ্ছে।'
খুবই অবাক হয়ে পরানবাবু বললেন, 'বটে! তা তুমি করো কী হে বাপু?'
'আজ্ঞে, এই একটু চাষবাস আছে। তিন বিঘে জমিতে সামান্যই হয়।'
নাক কুঁচকে পরানবাবু বললেন, 'এঃ, মোটে তিন বিঘে! ছ্যা: ছ্যা:, ও বেচে দাও।'
'বলেন কী বাবু! বেচলে খাব কী?'
ভারি বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে পরানবাবু বললেন, 'খাবে? কত খাবে হে হলধর? খেয়ে শেষ করতে পারবে ভেবেছ! হুঁ:, খাবে!'
কথাটা অনেকের কানে গেল। গাঁয়ের মুরুব্বিরা বললেন, 'ওরে গদাধর, পরান হল বাকসিদ্ধাই। যা বলে, তাই ফলে! ভালোয় ভালোয় জমিজমা বেচে দে বাবা।'
শুনে ভারি দমে গেল গদাধর। শুধু একটা খ্যাপাটে লোকের কথা শুনে এরকম কাজ করাটা কি ঠিক হবে? জমি সামান্য হোক, বছর বছর সামান্য যে ফসলটুকু দেয়, জমি বেচলে যে তাও জুটবে না!

তার বউ ময়না ভারি ধর্মভীরু মেয়ে। ঘরে লক্ষ্মীর পট বসিয়েছে, ষষ্ঠী, শিবরাত্রি ব্রত-উপবাস সব করে। সেও শুনে বলল, 'পরানবাবু কিন্তু সোজা লোক নয়। যা বলে তাই হয়।'

এসব শুনে ভারি ধন্দে পড়ে গেল গদাধর। তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি নেই, দূরদর্শিতা নেই, জমি চাষ করা ছাড়া আর কোনো কাজও সে পারে না। একটা পাগল লোকের কথায় ঝুঁকি নেওয়াটা ভারি আহাম্মকি হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু গাঁয়ের পাঁচজনের তাড়নায় আর বউ ময়নার তাগাদায় অবশেষে সে জমি বেচে এক পোঁটলা টাকা পেল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। এই ক-টা টাকা কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরোবে। তারপর কী যে হবে! ভেবে বুক শুকিয়ে গেল তার।

বিপদ কখনও একা আসে না। জমিবেচা কয়েক হাজার টাকা বালিশের নীচে রেখে রাতে ঘুমিয়ে ছিল গদাধর। খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ, ঘুমটা বটে একটু গাঢ়ই হয় তার। কিচ্ছু টের পায়নি। সকালে উঠে বালিশ উলটে দেখল, তলাটা ফাঁকা। দরজার খিলও ভাঙা।

ফের মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল সে।

থানা-পুলিশ করে কোনো লাভ নেই। থানা পাঁচ মাইল দূর। তার মতো চাষাভুসো থানায় এত্তেলা দিলে কেউ পুঁছবেও না। তার কাছে টাকাটা অনেক বটে, কিন্তু পুলিশ শুনে নাক সিঁটকোবে।

ময়নারও মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মোলায়েম গলায় বলল, 'ভেঙে পড়ার কী আছে! আমার লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে দু-দিন তো চলুক।'

নুন-ভাত, শাক-ভাত খেয়ে ক-টা দিন কাটল বটে, কিন্তু তারপর আর চলছে না।

ময়না বলল, 'চলো, অন্য গাঁয়ে যাই। দরকার হলে তুমি মুনিষ খাটবে। আমি লোকের বাড়িতে কাজ করব। এ গাঁয়ে ওসব করলে তো বদনাম হবে।'

'বাপ-পিতেমোর গাঁ ছেড়ে যাব?'

'তবে কি মরবে নাকি?'

কাহিল গলায় গদাধর বলল, 'তাই চলো।'

পাছে কেউ দেখতে পায়, সেই ভয়ে সন্ধের পর দুটি পোঁটলা নিয়ে দুজন গাঁ ছেড়ে রওনা হল।

গাঁ ছেড়ে বেরোতে-না-বেরোতেই প্রচন্ড কালবোশেখির ঝড় ধেয়ে এল। আকাশে ঘন বিদ্যুতের চমক, বাজ পড়ার পিলে চমকানো আওয়াজ আর তুমুল হাওয়া। দুজনে হাত ধরাধরি করে পড়ি কি মরি ছুটতে লাগল। অন্ধকারে পথের মোটে হদিশই পেল না। শুধু টের পাচ্ছিল, হাওয়া তাদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঝোপ, জঙ্গল, মাঠঘাট পেরিয়ে তারা দিগবিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে। বৃষ্টির তোড়ে তাদের জামাকাপড়, পোঁটলাপুঁটলি ভিজে জবজব করছে। দমসম হয়ে যাচ্ছে তারা। বাতাসের শব্দে আর বাজের আওয়াজে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। হাঁ করলেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কালবোশেখির নিয়ম হল, সে বেশিক্ষণ থাকে না। আধঘণ্টা পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি কমল। কিন্তু চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথাও কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না।

দুজনে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গদাধর বলল, 'এ কোথায় এলুম!'

ময়না বলল, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ভয় করছে।'

জমিজমা আর টাকাপয়সা সব হাতছাড়া হওয়ায় গদাধরের আর ভয়ডর নেই। সে ময়নার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'আর ভয়টা কীসের?'

ময়না বলল, 'চলো, ফিরে যাই।'

গদাধর একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? এ কোন জায়গাটায় এসে পড়লুম তাই বা কে জানে? পথঘাট আন্দাজ করা কি সোজা? ঝড়ের ধাক্কায় অনেকটা এসে পড়েছি। চলো, দেখি একখানা

গ্রামট্রাম পাওয়া যায় কিনা!'
অন্ধকারে ঝোপজঙ্গল ভেঙে তারা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। গ্রাম বা লোকবসতি পেলেই যে আশ্রয় মিলবে এমন ভরসা নেই। উটকো লোককে কেই-বা আদর করে ঘরে জায়গা দেয়? আজকাল যা চোর-ডাকাতের উপদ্রব।
একটা জঙ্গলমতো জায়গা পেরোতেই সামনে একটা আলো দেখতে পেল গদাধর। বলল, 'ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে। চলো, দেখা যাক, মাথা গোঁজার জায়গা মেলে কিনা!'
সামনে এগিয়ে একখানা মাঠকোঠা দেখা গেল বটে, তবে তার বেশ দৈন্যদশা। সামনের ঘরে একখানা হ্যারিকেন জ্বলছে। বন্ধ দরজায় খুটখুট শব্দ করে গদাধর ভারি বিনয়ের গলায় বলল, 'আমরা বড়ো দুঃখী মানুষ। মশাই, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে?'
ভিতর থেকে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল, 'ভিতরে এসো, দরজা ভেজানো আছে।'
দুজনে ভারি জড়সড়, ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকল। ঘরের কোনে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, সামনে একটা তক্তপোশ, তাতে গোটানো বিছানা, কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা, কিছু হাঁড়িকঁ¥ড়ি। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।
গদাধর গলাখাঁকারি দিয়ে ভারি নরম সুরে বলল, 'আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। উৎপাত করতেই এসেছি বলতে পারেন। তবে বিপদে পড়েই আসা। আমরা বড়ো দুর্দশায় পড়েছি কিনা!'
কে যেন ভরাট গলায় বলে উঠল, 'দুর্দশার তো কিছু দেখছি না হে! কে বলল দুর্দশায় পড়েছ? একটু হাওয়া ছেড়েছিল আর দু-ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে, এই তো! তা চাষিবাসিকে তো ঝড়ে-জলে কতই কাজ করতে হয়।'
'তা বটে,' বলে গদাধর হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, 'যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দেন তো দাওয়াতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেবখন।'
'দাওয়ায়! দাওয়ায় কেন হে? দিব্যি ঘরদোর রয়েছে, দাওয়ায় থাকবে কোন দুঃখে? ভিতরের ঘরে যাও, শুকনো কাপড়টাপড় পাবে। পরে নাও গে। উনুনে আঁচ দেওয়া আছে, খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।'
ময়না ফিসফিস করে বলল, 'গলা পাচ্ছি বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো!'
গদাধরও ভড়কে গিয়ে বলল, 'তাই তো!'
ময়না বলল, 'জিজ্ঞেস করো না!'
গদাধর ফের হাত কচলে বলল, 'আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন আজ্ঞে? সামনে এলে একটু পদধূলি নিতুম।'
'ও বাবা, পদধূলি বড়ো কঠিন জিনিস। খুঁটির গায়ে একটা হাতআয়না ঝুলছে দেখতে পাচ্ছ?'
গদাধর ইতিউতি তাকিয়ে দেখল, ভিতরের দরজার পাশে কাঠের খুঁটিতে একটা ছোট্ট হাতআয়না ঝুলছে বটে।
'আয়নাখানা পেড়ে ওর ভিতরে তাকাও।'
গদাধর অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নাটা পেড়ে তুলে ধরতেই এমন আঁতকে উঠল যে, একটু হলেই সেটা পড়ে যেত হাত থেকে। আয়নার ভিতরে একখানা সুড়ুঙ্গে লম্বা মুখ। গোঁফ আছে। জুলজুলে চোখ। মাথায় বাবরি চুল। ভয়ের কথা হল, সে মুখের ঠোঁট নড়ছে আর কথা বেরিয়ে আসছে।
দুজনেরই ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।
আয়নার লোকটা বলল, 'ওরে বাপ, আগে তো প্রাণ রক্ষে হোক, তারপর দাঁতকপাটি লেগে পড়ে থাকলে থেকো।'
ময়না আর গদাধর কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ময়নাই প্রথম কথা কয়ে উঠল, 'আমরা বড্ড ভয় পাচ্ছি যে!'
'বলি ভয়টা কীসের, অ্যাঁ। এই জন্যই বলে লোকের উপকার করতে যাওয়াটাই আহাম্মকি।'

গদাধর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, ওর উপর কুপিত হবেন না, আমরা না-হয় ভয়ডর সব গিলে ফেলছি।'
'ভালো। টপ করে ওসব ফালতু জিনিস গিলে পেটে চালান করে দাও। দিয়েছ?'
ময়না আর গদাধর ঘনঘন ঢোক গিলে যেন একটু সামলে নিল। গদাধর বলল, 'না:, এখন আর তেমন বুক ঢিবঢিব করছে না। তোমার করছে ময়না?'
'না:। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, এই যা!'
আয়নার লোকটা বলল, 'ওতেই হবে। এখন গিয়ে রান্নার জোগাড়যন্তর করে ফ্যালো।'
গদাধর আমতা-আমতা করে বলল, 'ফস করে অন্দরমহলে ঢুকব? কেউ যদি কিছু বলে?'
লোকটা হা: হা: করে হেসে বলল, 'বলার মতো আছেটা কে হে? এই আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর জনমনিষ্যি নেই। যাও যাও, ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া ধরে ফেলবে।'
কথা না-বাড়িয়ে তারা ভিতরের ঘরে এসে দেখল, দিব্যি ব্যবস্থা। আলনায় কয়েকখানা পাটভাঙা ডুরে শাড়ি, দুটো ধোয়া ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ রয়েছে।
কুয়ো থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে, ভেজা কাপড় বদল করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, উনুনে আঁচ উঠে গেছে। চালডাল খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল। আলু, লঙ্কা, ফোড়ন, তেল সবই অল্পস্বল্প রয়েছে।
ময়না বলল, 'হ্যাঁ গা, আয়নার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাদের সঙ্গে খাবেন কিনা।'
গদাধর গিয়ে আয়নাটা নিয়ে এল, তারপর সুড়ুঙ্গে মুখখানার দিকে চেয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'আজ্ঞে, আপনি পেরসাদ করে না-দিলে কোন মুখে খিচুড়ি খাই বলুন। ময়নার বড়ো ইচ্ছে আপনাকেও একটু ভোগ চড়ায়।'
'না হে বাপু, ওসব আমার সহ্য হয় না। আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমরা খাও।'
কী আর করা, অন্যের বাড়িতে ঢুকে এরকম রেঁধেবেড়ে খাচ্ছে বলে ভারি সংকোচ হচ্ছে তাদের। তবে খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তার লজ্জার সঙ্গেই পেটপুরে খেয়ে নিল।
তারপর দুজনে ক্লান্ত শরীরে আর ভরা পেটে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপর আর একজন রোগাপানা লোক এসে হাজির সঙ্গে মুটের মাথায় দুটো ভরা বস্তা ।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর গদাধরের মনে হল, গতকাল ঝড়ে-বৃষ্টিতে পড়ে তার মাথাটাই গুলিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় একটা আজগুবি স্বপ্ন দেখেছে। ময়নাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে ময়না বলল, 'দুজনে কি একই স্বপ্ন দেখতে পারে?'
'তাহলে ব্যাপারটা কী?'
'তার আমি কী জানি!'

বাইরে কে যেন 'কে আছো হে! কে আছো?' বলে চেঁচাচ্ছিল। গদাধর তাড়াতাড়ি উঠে সদর দরজা খুলে দেখল, নাদুসনুদুস একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দড়িতে বাঁধা দুটো হালের বলদ, একটা দুধেল গাই, আর একটা হাল।

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই নাও ভাই, ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত হাল-গোরু সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আর এই নাও, এক বছরের হাল-গোরুর ভাড়া আর দুধ বাবদ দাম। সাতশো টাকা আছে।'

গদাধর জিভ কেটে পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'না না, ছি:-ছি:, এসব আমার পাওনা নয়। আমাকে কেন দিচ্ছেন?'

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না-দিলে কি রেহাই আছে হে! ষষ্ঠীপদ ঘাড় মটকাবে। বুঝে নাও ভাই, কাল রাতেই ষষ্ঠীপদ হুকুম দিয়ে গেছে।'

'আজ্ঞে, ষষ্ঠীপদ কে বটেন?'

'কেন, পরিচয় হয়নি নাকি? বলি, সে এখন আয়নার মধ্যে ঢুকেছে বলে তো আর গায়েব হয়ে যায়নি। তার দাপটে এখনও সবাই থরহরি কাঁপে। ওই পুবে খালধারের জমিটা তোমার। দশ বিঘে আছে।'

কিছুই বুঝতে পারল না গদাধর। লোকটা চলে যাওয়ার পর গোরু আর বলদদের নিয়ে গোয়ালে বেঁধে টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে সে গিয়ে আয়নাটা পেড়ে আনল। কিন্তু দিনমানে আয়নায় আর সেই সুড়ুঙ্গে মুখখানা দেখা গেল না। নিজের বোকা-বোকা হতভম্ব মুখখানাই দেখতে পেল সে।

এরপর আর একজন রোগাপানা লোক এসে হাজির সঙ্গে মুটের মাথায় দুটো ভরা বস্তা।

'এই যে ভায়া, আমি হচ্ছি শ্যামাপদ মুদি। দু-বস্তা চাল দিয়ে গেলুম। ষষ্ঠীপদর হুকুম তো, আর অমান্যি করতে পারি না। এই দু-বস্তাই পাওনা ছিল তোমাদের। আর এই হাজারটা টাকা।'

গদাধর কথা কইতে পারছে না। কেবল ঢোক গিলছে। জিভ, টাগরা সব শুকনো।

একটু বেলার দিকে একজন বউমানুষ এসে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা ময়নার কাছে হাজির। একটা পোঁটলা খুলে কিছু সোনার গয়না বের করে বলল, 'নাও বাবু। তোমার জিনিস বুঝে নাও। মোট আটগাছা সোনার চুড়ি, বাঁধানো নোয়া, বিছেহার, এক জোড়া বালা আর ঝুমকো দুল।'

ময়না অবাক হয়ে বলল, 'এসব আমার হবে কেন?'

'তা জানি না, ষষ্ঠীপদ গচ্ছিত রেখেছিল। এখন হুকুম হয়েছে, তাই দিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি তো ষষ্ঠীপদবাবুকে চিনিই না।'

'চিনবে বাপু, এ গাঁয়ে থাকলে তাকে না-চিনে উপায় আছে? তা তোমাদের কপাল ভালো যে, তার নেকনজরে পড়েছ। তার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থাকি কিনা!'

সারাদিনে আরও অনেকে এসে অনেক জিনিস দিয়ে গেল। কেউ দা আর কুড়ুল, কেউ শীতলপাটি, কেউ কুয়োর বালতি আর কাঁটা, কেউ কাঠের টুল, কেউ বাসনকোসন বা কড়াই আর হাতা, এমনকী একগাছ ঝাঁটা অবধি। সবই নাকি ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত রাখা জিনিস।

গদাধর আর ময়নার দিশেহারা অবস্থা। গরিব হলেও তারা লোভী লোক নয়। এসব জিনিস তাদের ঘরে ছিল না। তার ওপর ষষ্ঠীপদর রহস্যটাও তাদের মাথায় সেঁধোচ্ছে না।

খুব ভাবনাচিন্তার মধ্যেই দিনটা কাটল তাদের। সন্ধে হতেই হঠাৎ সেই বাজখাঁই গলা, 'সব জিনিস ফেরত দিয়ে গেছে তো?'

গদাধর তাড়াতাড়ি আয়নাটা পেড়ে দেখল, সেই সুড়ুঙ্গে মুখ। কাঁপা গলায় বলল, 'এসব কী হচ্ছে বলুন তো মশাই? আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

লোকটা ধমক দিয়ে বলল, 'বেশি বুঝবার দরকার কী তোমার? কাল থেকে তেঁতুলতলার জমিতে হাল দিতে শুরু করো।'

'আমরা কি তবে এখানেই থাকব?'

‘তবে যাবে কোন চুলোয়?’
ময়না পিছন থেকে ফিসফিস করে বলল, ‘ওগো, রাজি হয়ে যাও।’
গদাধর গদগদ হয়ে বলল, ‘যে আজ্ঞে!’

ভূতের ভবিষ্যৎ

বাসবনলিনী দেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল-কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যেসব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু-হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড়ো কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পালটাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচন্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘরসংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমতো বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র-কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে 'নাড়ু খাব, নাড়ু খাব' বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড়ো ছেলের ছোটো ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন ছেলের কোন ছেলের কোন ছেলে, বা কোন মেয়ের কোন মেয়ের কোন মেয়ের মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন ছেলের কোন মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কম্পিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন।

কাজেই অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে, কোনটা খেতে ভালোবাসে, কোনটা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কম্পিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, 'মা নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব?'

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি!'

'ভুল হয়ে গেছে মা।'

'অত ভুল হলে চলে কী করে? দেখছিস তো বড়ো কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি, দে তো একটা।'

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, ‘খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।’

‘আচ্ছা মা।’ বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক করে একটা কাশির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসংকোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, ‘আবার এ-ঘরে ছোঁক ছোঁক করছ কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন?’

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার-পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বলেন, ‘ছোঁক ছোঁক করি কি আর সাধে? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার-মার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।’

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, ‘ওরে বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।’

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু-খানা দু-গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, ‘তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?’

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন ‘ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস?’

‘যাই মা।’ বলে সাড়া দেয় একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, ‘বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি!’

‘খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।’

‘তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খনিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভালো করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।’

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ‘নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।’

বাসবলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, ‘ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণমেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।’

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ‘দক্ষিণমেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও?’

‘কেন কী হয়েছে?’

‘সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারি ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-মস্ত হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।’

‘তাই যাও। কিন্তু সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।’

‘হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব?’

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, ‘এবার অটোবড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভালো করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয়!’

‘দিচ্ছি মা।’

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রে-টা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।
বড়ি-বেলুন দিব্যি গড় গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল-পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না-শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশগুণ বাড়িয়ে দেবে, পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি-বেলুনে একটা পাহারাদার কম্পিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমতো ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপরে-নীচে সরে যায়।
বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানলার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না-গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছে-গুছে শাকপাতা কিনতে ভালোবাসেন। নিজে না-কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।
বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাবল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাবল বা বুদবুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।
বুদবুদ বন্দী হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে।
রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোটো ছোটো ট্যাবলেট বা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনো ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাথ। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলেই জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।
তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছোলেন।
বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে-যার পছন্দমতো আলু-কুমড়ো-পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকার হয় না। শূন্যে নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা-থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল-ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনো বাধা নেই।
বাজারের ফটকেই ছোটো-ছোটো ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।
বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনো অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারেজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত

জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য-পানীয়ের একখানা ছোটো আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই-চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদবুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড়ো বড়ো উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনো পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে-নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে কেউ-কেউ। হাওয়াই বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি-বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, 'কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?'

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভটচাযের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর একসময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম-জাম-কাঁঠাল কিচ্ছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটের, কোনো অসুবিধেই হত না। এই বড়ি-বেলুনে রোদে-দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড়ো কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেবখন।'

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।'

'কেন রে কী হল?'

'আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিয়োতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারি বেয়াড়াপনা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।'

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলিস কী! এতো সব্বোনেশে কান্ড।'

রেমো একটু হেসে বলল, 'তোমরা পুরোনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ-যুগের কোনো খবরই রাখো না। তবে ভালোর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার-দাবারে বিষটিস মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।'

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিন্ডটা কলের না-হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা এইসব কান্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়া খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।'

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কবজায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতি ভাই, তলায় তলায় সকলে সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যান্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনোনি?'

'না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।'

‘যাই ঠাকুমা, মা-বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।’

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখন বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অক্সিজেন-রুমাল মাঝে মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই-জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউ ঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা, যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট কাজের-লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট-ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরিওয়ালারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না-করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট-ডাক্তার, রোবট-নার্স। বাসবনলিনী খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজী গলায় বলেছিলেন, ‘ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় দেগা যে, আক্কেল গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস?’

গঙ্গারাম একটু বোকা গোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনো নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, ‘শোনো, এখন চাকরবাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পালটে গেছে।’

আশুবাবু রেগে গিয়ে বললেন, ‘কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায় ?’

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, ‘আঃ আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যেসব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?’

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না-হয়ে বললেন, ‘শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আশকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যাণ্ড চাইছে। এরপর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।’

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, ‘সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তাহলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?’

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, ‘অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।’

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, ‘কী ওষুধ?’

আশুবাবু খুব হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, ‘আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।’

‘বলো কী? চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।’

‘দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না। তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।’

‘না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।’

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন...

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।
একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, 'বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তার চেয়েও বড়ো কথা, ভয়-টয় পেতে পারো।'
'জিনিসটা কী?'
'দেখলেই বুঝবে।'
এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভূত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'ওঁ ফট, ওঁ ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া...' ইত্যাদি।
বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।
বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে?'
আশুবাবু হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, 'এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।'
'কিন্তু লোকটা আসলে কে?'
একথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো-করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, 'এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত। এক্কেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখাসাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলুম, হচ্ছিল না, তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।'
শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।
আশুবাবু তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, 'আর ভয় নেই গিন্নি ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদের টিটB করবে ওরাই।'
কেলে ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, 'এজ্ঞে, এক্কেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব, কোনো চিন্তা করবেন না।'
বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবারা।'

টেলিফোনে

টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গন্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে-মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড়ো অফিসার। বহুবছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড়ো পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজি হননি।

দুপুরের লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, 'হ্যালো! হ্যালো!'

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তাহলেও তো ওপাশ থেকে কেউ-না-কেউ সাড়া দেবে!

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল...

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।
দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।
প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা-বাবার শরীর খারাপ হল না তো!
ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।'
ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।
কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, 'সার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনো গন্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।'
'কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।'
'হয়তো ক্রস কানেকশান হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহুপুরোনো, তাই মাঝে-মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।'
বাস্তবিকই লোকটা কানেকশান কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।
ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান ...' গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।
বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?
কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার...?
না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদবেগটাও আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।
কিন্তু রবিবার সকালে গলফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে...।
সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, 'হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট?'
অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, 'দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে...'
প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতিমিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।
এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?
হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?
আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড়ো ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গলফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?
ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছোনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গলফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।
সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গলফের বিশাল মাঠ। মাঝে-মধ্যে ঝোপজঙ্গল, জলা। অনেক গলফ-খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।
বলটা একটা ঝোপজঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।
সেই জঙ্গলে নীচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, 'দিস ইজ দ্য ডে...'
একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচন্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।
প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য সে বেঁচে গেছে।
উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। কে তাকে মারতে চায়? কেনই বা?
বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশেপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশেপাশে।
সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া

হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'এই নম্বর তো!'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?'

'প্রদীপ রায়।'

'ওঃ, হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?'

'না। বিলটা একটু ইরেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।'

'খুব ভালো। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।'

'বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

'হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।'

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, 'হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কান্ড হচ্ছে...'

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা গুড নাইট।'

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

হরবাবুর অভিজ্ঞতা

নিশুত রাতে হরবাবু নির্জন অন্ধকার মেঠো পথ ধরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বৃষ্টিবাদলার দিন। পথ জলকাদায় দুর্গম। তার ওপর আকাশে প্রচন্ড মেঘ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হরবাবুর টর্চ আর ছাতা আছে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। টর্চের আলো নিবুনিবু হয়ে আসছে আর হাওয়ায় ছাতা উলটে যাওয়ার ভয়। বর্ষা-বাদলায় সাপখোপের ভয়ও বড়ো কম নয়। গর্তটর্ত বুজে যাওয়ায় তারা আশ্রয়ের সন্ধানে ডাঙাজমির খোঁজে পথে-ঘাটে উঠে আসে।

হরবাবুর অবশ্যই এই নিশুত রাতে পৌঁছোনোর কথা নয়। কিন্তু ট্রেনটা এমন লেট করল যে হরিণডাঙা স্টেশনে নামলেনই তো রাত সাড়ে দশটায়। গোরুরগাড়ির খোঁজ করে দেখলেন সব ভোঁ ভাঁ, এমনকি তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁ গোবিন্দপুর যাওয়ার সঙ্গীসাথিও কেউ জুটল না। গোবিন্দপুর না-হোক দুই-তিন মাইল রাস্তা। হরবাবুর ভয় ভয় করছিল। কিন্তু উপায়ও নেই। তাঁর শালার বিয়ে। হরবাবুর স্ত্রী চার-পাঁচদিন আগেই ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। হরবাবুর জন্যে তারা সব পথ চেয়ে থাকবে।

সামনেই তুলসীপোতার জঙ্গল। একটু ভয়ের জায়গা, আধমাইলটাক খুবই নির্জন রাস্তা। আশেপাশে বসতি নেই। হরবাবু কালী-দুর্গা স্মরণ করতে করতে যাচ্ছেন। বুকটা একটু কাঁপছেও। এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পৃথিবীটা যে কেন এত পেছিয়ে আছে, তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ফিরিঙ্গির হাট ছাড়িয়ে ডাইনে মোড় নিতে হবে। কিন্তু এত জম্পেশ অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না, টর্চবাতির আলো চার-পাঁচ হাতের বেশি যাচ্ছে না। বড়োই বিপদ।

হরবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, —ওঃ আজ বেঘোরে প্রাণটা না-যায়। ডান দিকে তুলসীপোতার রাস্তার মুখটা খুঁজে পেয়েও দমে গেলেন হরবাবু। এতক্ষণ যাইহোক শক্ত জমির ওপর হাঁটছিলেন। এবার একেবারে থকথকে কাদা।

—হরি হে, এই রাস্তায় মানুষ যেতে পারে? পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য নেই।

হরবাবু আপনমনে কথাটা বলে ফেলতেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল,—তা যা বলেছেন।

হরবাবু এমন আঁতকে উঠলেন যে, আর একটু হলেই তাঁর হার্টফেল হত। পিছনে তাকিয়ে দেখেন, একটা রোগা আর লম্বাপানা লোক। হরবাবুর সঙ্গে শালার বউয়ের জন্য গড়ানো একছড়া হার আছে। কিছু টাকাপয়সাও। লোকটা ডাকাত নাকি? হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন,—আপনি কে?

—চিনবেন না। এদিক পানেই যাচ্ছিলাম।

—অ। তা ভালো।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন? গোবিন্দপুর নাকি?

হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন, —হ্যাঁ, সেখানেই যাওয়ার কথা।

লোকটা একটু হাসল,—যেতে পারবেন কি? এখন তো এই কাদা দেখছেন, গোড়ালি অবধি। এরপর হাঁটু অবধি গেঁথে যাবে।

—তাহলে উপায়? আমার যে না-গেলেই নয়।

লোকটা একটু হেসে বলে,—উপায় কাল সকাল অবধি বসে থাকা। তারপর ভোরবেলা ফিরিঙ্গির হাট থেকে গোরুরগাড়ি ধরে শিয়াখালি আর চটের হাট হয়ে গোবিন্দপুর যাওয়া। তাতে অবশ্য রাস্তাটা বেশি পড়বে। প্রায় সাত-আট মাইল। কিন্তু বর্ষাকালে তুলসীপোতা দিয়ে যাতায়াত নেই।

—রাত এখানে কাটাব? থাকব কোথায়?
—তার আর ভাবনা কী? একটু এগোলে ওই জঙ্গলের মধ্যে আমার দিব্যি ঘর আছে। আরামে থাকবেন।
হরবাবু খুব দোটানায় পড়লেন বটে, কিন্তু কী আর করেন। লোকটা যদি তাঁর সব কেড়েকুড়েও নেয় তাহলে কিছু করার নেই বটে। কিন্তু গোবিন্দপুর যে পৌঁছোনো যাবে না তা বুঝতে পারছেন।
আমার পিছু পিছু আসুন। —বলে লোকটা একটু এগিয়ে গেল।
হরবাবু খুব ভয়ে ভয়ে আর সংকোচের সঙ্গে তার পিছু পিছু যেতে যেতে বললেন—তা আপনার বাড়ি বুঝি ফিরিঙ্গির হাটে?
—তা বলতে পারেন। যখন যেখানে ডিউটি পড়ে সেখানেই যেতে হয়। আমার কাছে সব জায়গাই সমান। তবে আপনার এই পৃথিবীটা যে বাসযোগ্য নয় তা খুব ঠিক কথা। এখানে হরকিত, গুবজোর, সেরোঙ্গি কিছুই পাওয়া যায় না। বড্ড অসুবিধে।
লোকটা পাগল নাকি? হরবাবু অবাক হয়ে বললেন, —কী পাওয়া যায় না বললেন?
—বলে লাভ কী? আপনি পারবেন জোগাড় করে দিতে? ওসব হচ্ছে খুব ভালো ভালো সব সবজি।
—জন্মে যে নামও শুনিনি! এসব কি বিলেতে হয়?
—না মশায়, না। বিলেতের বাজারও চষে ফেলেছি।
খুবই আশ্চর্য হয়ে হরবাবু বললেন, — বিলেতেও গেছেন বুঝি?
—কোথায় যাইনি মশায়। ছোটো গ্রহ, এমুড়ো-ওমুড়ো টহল দিতে কতক্ষণই বা লাগে।
হরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই দুর্যোগের রাতে শেষে কী পাগলের পাল্লায় পড়লেন?
লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল—নিতান্তই পেটের দায়ে পড়ে থাকা মশাই। নইলে এই অখাদ্য জায়গায় কেউ থাকে? এখানে ফোরঙ্গলিথুয়াম হয় না, কাঙ্গারাঙ্গা নেই, ফেজুয়া নেই—এ জায়গায় থাকা যায়?
হরবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—এগুলোও কি সবজি?
—আরে না। আপনাকে এসব বুঝিয়েই বা লাভ কী? আপনি এসব কখনো দেখেননি, জানেনও না। ফোরঙ্গলিথুয়াম একটা ভারি আমোদপ্রমোদের ব্যাপার। কাঙ্গারাঙ্গা হল খেলা। ফেজুয়া হল—না:, এটা বুঝবেন না।
হরবাবু মাথা নেড়ে বললেন—আজ্ঞে না। আমার মাথায় ঠিক সেঁধোচ্ছে না। তা মশাইয়ের দেশ কি আফ্রিকা?
—হাসালেন মশাই। আফ্রিকা হলে চিন্তা কী ছিল! এ হল জরিভেলি লোকের ব্যাপার।
—জরিভেলি?
—শুধু জরিভেলি নয়, জরিভেলি লোক। এই আপনাদের মোটে ন-টি গ্রহ নয়, আমাদের ফুন্দকনীকে ঘিরে পাঁচ হাজার গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। সব ক-টা নিয়ে জরিভেলি লোক। এলাহি কান্ড।
হরবাবু মূর্ছা গেলেন না। কারণ লোকটা পাগল। আবোল-তাবোল বকছে।
কিন্তু কয়েক কদম যেতে-না-যেতেই হরবাবু যে জিনিসটা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া। জঙ্গলের মধ্যে ছোটোখাটো একটা বাড়ির মতো একখানা মহাকাশযান। আলোটালো জ্বলছে। ভারি ঝলমল করছে জিনিসটা।
—আসুন, ভিতরে আসুন। আমি একা মানুষ, আপনার আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটবে।
ভিতরে ঢুকে হরবাবু যা দেখলেন, তাতে তাঁর মূর্ছা যাওয়ারই জোগাড়। হাজার কলকবজা, হাজার কম্ভূত সব জিনিস। কোথাও আলো জ্বলছে-নিবছে, কোথাও হুস করে শব্দ হল, কোথাও পিঁ পিঁ করে কী যেন বেজে গেল, কোথাও একটা যন্ত্র থেকে একটা গলার স্বর অচেনা ভাষায় নাগাড়ে কী যেন বলে চলেছে—লং পজং ঢাকাকাল লং পজং পাকালাব...
হরবাবুর মাথা ঘুরছিল। তিনি উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

হরবাবু মহাকাশযান থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে লাগলেন ।...

লোকটা তাড়াতাড়ি কোথা থেকে একগেলাস কালোমতো কী একটা জিনিস এনে তাঁর হাতে দিয়ে বলল,—খেয়ে ফেলুন।
হরবাবু বুক ঠুকে খেয়ে ফেললেন। একবারই তো মরবেন। তবে স্বাদটা ভারি অদ্ভুত। ভিতরটা যেন আরামে ভরে গেল।
—এসব কী হচ্ছে মশাই বলুন তো?
লম্বা লোকটা ব্যাজার মুখে বলল—কী আর হবে? আমার এখানে পোস্টিং হয়েছে। পাক্কা তিনটি মাস—আপনাদের হিসেবে—এইখানেই পড়ে থাকতে হবে।
—কীসের পোস্টিং?
—আর বলবেন না মশাই। এতদিন জরিভেলির বাইরে আমরা আর কোথাও যেতাম না। এখন হুকুম হয়েছে, কাছেপিঠে যে-ক-টা লোক আছে সেগুলো সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সোজা কাজ নাকি মশাই? যেখানে পোস্টিং হবে, সেখানকার ভাষা শেখো রে, সেখানকার আদবকায়দা রপ্ত করো রে, সেখানকার অখাদ্য খেয়ে পেট ভরাও রে। না:, চাকরিটা আর পোষাচ্ছে না।
হরবাবু একটু একটু বুঝতে পারছেন, লোকটা গুল মারছে না। তিনি উঠে একটা চেয়ারগোছের জিনিসে বসে পড়ে বললেন,—আপনাদের জরিভেলি কতদূর?
—বেশি নয়। আপনাদের হিসেবে মাত্র একশো তেত্রিশ আলোকবর্ষ দূরে।
—অ্যাঁ।
—হ্যাঁ, তা আর বেশি কী? আমার এই গাড়িতে ঘণ্টা খানেক লাগে।
—অ্যাঁ।
—হ্যাঁ।
হরবাবু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, ‘তাহলে আর আমার শ্বশুরবাড়ি গোবিন্দপুর এমনকি দূর?’
—কিছু না, কিছু না।
হরবাবু মহাকাশযান থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে লাগলেন।

ঘুড়ি ও দৈববাণী

অঘোরবাবু নিরীহ মানুষ। বড়োই রোগা-ভোগা। তাঁর হার্ট খারাপ, মাজায় সায়াটিকার ব্যথা, পেটে এগারো রকমের অসুখ। অফিসে তাঁর উন্নতি হয় না। কেউ পাত্তা দেয় না তাঁকে।

অঘোরবাবু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই ভালোবাসেন। তাঁর শখ-শৌখিনতা বলতে ওই একটাই। ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরি করেন। মস্ত মস্ত ঘুড়ি। মোটা সুতো আর মস্ত লাটাই দিয়ে অনেক ওপরে ঘুড়ি ভাসিয়ে দেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাটাই ধরে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকেন।

সেদিন একটা কান্ড হল। বিকেলবেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুড়ি ওড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে আসায় লাটাই গুটিয়ে যখন ঘুড়িটা ছাদ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হল, ঘুড়ির গায়ে একটা কিছু যেন লেখা আছে। ঘরে এসে আলো জ্বেলে দেখলেন, সাদা ঘুড়িতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা, আগামী সতেরো তারিখে আপনার মৃত্যু হবে, যদি না একখানা আস্ত গায়ে-মাখা সাবান খেয়ে ফেলেন।

অঘোরবাবু ঘোরতর অবাক। প্রায় আধ কিলোমিটার ওপরে উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে এই বিদঘুটে কথাটা লিখল কে? ভৌতিক কান্ড নাকি? মহাভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। পাশের বাড়িতেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরঞ্জয় প্রামাণিক থাকেন। অঘোরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ডেকে ঘুড়ির গায়ে লেখাটা দেখিয়ে বললেন, এটা কী করে সম্ভব হল?

পরঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে সাবানটা খেয়ো না, সাবান খেলে পেট খারাপ হয়। মনে হচ্ছে কেউ রসিকতা করেছে।

অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু আকাশের অত ওপরে কোনো রসিকের তো থাকার কথা নয়। রসিকদের কি আজকাল ডানা গজাচ্ছে?

পরঞ্জয় এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অঘোরবাবু হিসেব করে দেখলেন সতেরো তারিখের আর মোটে সাতদিন বাকি। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না-বলে বাথরুমে গিয়ে একখানা গায়ে-মাখা সাবান অত্যন্ত কষ্ট করে খেয়ে ফেললেন। সাবান যে খেতে এত বিচ্ছিরি তা তাঁর জানা ছিল না।

পরঞ্জয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন অঘোরবাবু পেটের গোলমালে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। দু-দিন লাগল বিছানা ছেড়ে উঠতে। বিকেলে তিনি আবার ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে উঠলেন। এবং যথারীতি লাটাই গোটানোর পর দেখলেন ঘুড়ির গায়ে লেখা রয়েছে, আগামী সতেরো তারিখে আপনি মারা যাবেন, যদি না কৃষ্ণ কুন্ডুর কান মলে দেন।

কৃষ্ণ কুন্ডুর কান মলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ সে হল এ পাড়ার কুখ্যাত গুণ্ডা। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। গায়ে যেমন জোর তেমনি বদমেজাজ। অঘোরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই অনৈসর্গিক আদেশ অমান্য করতেও তাঁর সাহস হচ্ছে না। সতেরো তারিখের আর দেরিও নেই। আজ চোদ্দো তারিখ।

সন্ধের পর তিনি সোজা গিয়ে কৃষ্ণ কুন্ডুর বাড়িতে হাজির হলেন। কৃষ্ণ কুন্ডু তখন একটা মস্ত বড়ো ছোরা ধার দিচ্ছিল। তাঁকে দেখে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, কী চাই?

অঘোরবাবু কাঁপতে কাঁপতে সামনে গিয়ে আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ কুন্ডুর বাঁ-কানটা মলে দিয়েই দৌড় লাগালেন।

কিন্তু দৌড়ে পারবেন কেন? কৃষ্ণ কুন্ডু ছুটে এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে উঠোনে এনে ফেলল। তারপর মুগুরের মতো দু-খানা হাতে গদাম গদাম করে ঘুসি মারতে লাগল। তিনি ঘুসি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ায় পিঠের ওপর একেবারে তবলা লহরার মতো কিল-চড়-ঘুসি পড়তে লাগল। জীবনে এরকম সাংঘাতিক মার কখনো খাননি অঘোরবাবু। যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

ফের দু-দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল। তারপর অঘোরবাবু ফের একদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ালেন। আজও ঘুড়ি নামিয়ে দেখলেন তাতে লেখা, সতেরো তারিখে মৃত্যু অবধারিত, যদি না বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন।

বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার আদেশের চেয়ে মৃত্যুদন্ডই বোধহয় ভালো। কারণ অঘোরবাবুর অফিসের বড়ো সাহেব খোদ আমেরিকার রাঙামুখো সাহেব। যেমন রাশভারী, তেমনি শৃঙ্খলাপরায়ণ। পান থেকে চুন খসতে দেন না। তা ছাড়া বড়ো সাহেবের নাগাল পাওয়াও কঠিন। আলাদা ঘরে বসেন, বাইরে আর্দালিরা পাহারায় থাকে।

কিন্তু ঘুড়ির আদেশ অমান্য করতে সাহস হল না তাঁর। দোকান থেকে দই আনিয়ে গেলাসভরতি ঘোল তৈরি করে একটা ফ্লাস্কে ভরে অফিসে গেলেন অঘোরবাবু। খুবই অন্যমনস্ক, বুকটা দুরদুর করছে। বড়োবাবুকে গিয়ে একবার বললেন, বড়োসাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেবেন?

বড়োবাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিচ্ছো কেন? বড়ো সাহেব কী হেঁজিপেঁজির সঙ্গে দেখা করেন? আর করেই বা লাভ কী। সাহেবের আমেরিকান ইংরেজি কী তুমি বুঝবে? বুকনি শুনলে ভড়কে যাবে যে!

বেজার মুখে ফিরে এলেন বটে, অঘোরবাবু, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে বেরিয়ে করিডোর ঘুরে সোজা বড়ো সাহেবের খাস কামরার সামনে হাজির হলেন। দেখলেন বড়ো সাহেবের ঘর থেকে কয়েকটা লালমুখো সাহেব বেরিয়ে আসছে। আর্দালি দুটো তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

অঘোরবাবু সুট করে ঢুকে পড়লেন। বিশাল চেহারার বড়ো সাহেব মন দিয়ে একটা কাজ করছিলেন। মাথায় মস্ত গোলাপি রঙের টাক। অঘোরবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাবু?

অঘোরবাবু ফ্লাস্কটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে ঘোলটা ঢেলে দিলেন...

অঘোরবাবু ফ্লাস্কটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে ঘোলটা ঢেলে দিলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় নেমে একটা বাসে উঠে পড়লেন।

চাকরি তো যাবেই, পুলিশেও ধরতে পারে। তা হোক, তবু অনৈসর্গিক ওই আদেশ লঙ্ঘন করেনই বা কী করে?
সতেরো তারিখ এগিয়ে আসছে। আগামীকালই সতেরো তারিখ। বিকেলে অঘোরবাবু ফের ঘুড়ি ওড়ালেন। অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে নানা কথা ভাবছিলেন। বুকটাও দুরদুর করছে। তারপর ধীরে ধীরে লাটাই গোটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুড়িটা নেমে এল। ঘুড়িটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা, আগামী সতেরো তারিখে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না এক্ষুনি তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন।
অঘোরবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। তিনতলা থেকে লাফ দিলে যে মৃত্যুর জন্য আর সতেরো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু করেনই বা কী? ঘুড়ি মারফত দৈববাণীই হচ্ছে বলে তাঁর স্থির প্রত্যয় হয়েছে, দৈববাণীর আদেশ না-মানলে যদি ভগবান চটে যান?
অঘোরবাবু চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করলেন। শেষবারের মতো চারদিকটা জলভরা চোখে একবার দেখে নিলেন। এইসব কাজে বেশি দেরি করতে নেই। দেরি করলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বিধা আসে। অঘোরবাবু ধুতির কোঁচা এঁটে ছাদের রেলিঙের ওপর উঠে দুর্গা বলে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।
পড়ে মাজার ব্যথায়, ঘাড়ের ঝনঝনিতে, কনুইয়ের খটাং-এ, মাথার কটাং-এ চোখে সরষেফুল দেখতে দেখতে মূর্ছা গেলেন। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক সব দৌড়ে এল, কান্নাকাটি পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। প্রায় পনেরো দিন সেখানে পড়ে থাকতে হল। তারপর বাড়িতে এনে ফের কিছুদিন চিকিৎসা চলল তাঁর। পারিবারিক ডাক্তার অভয়বাবু তাঁর বন্ধুও বটে। অভয়বাবু কয়েকদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করার পর একদিন বললেন, বুঝলে অঘোর, একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।
অঘোরবাবু ভয় খেয়ে বললেন, কী ঘটেছে ভাই?
তোমার হার্ট একদম ভালো হয়ে গেছে।
সে কী! কী করে হল?
ওই যে কেষ্ট গুণ্ডার কাছে মার খেয়েছিলে, মনে হচ্ছে সেই শক থেরাপিতেই হার্টটা ঠিকঠাক চলতে শুরু করেছে। হার্টের একটা ভালভ কাজই করছিল না। এখন করছে। আরও একটা ব্যাপার!
আবার কী?
তোমার পেটে এগারো রকমের অসুখ ছিল। এখন একটাও নেই।
বলো কী হে!
হ্যাঁ। ওই যে সাবান খেয়েছিলে, ওর ঠেলাতেই পেটের সব রোগজীবাণু বেরিয়ে গেছে। এখন লোহা খেলেও তোমার হজম হবে। আরও একটা ব্যাপার।
অঘোরবাবু অবাকের পর আরও অবাক হয়ে বললেন, আরও?
হ্যাঁ। তোমার সায়াটিকা সেরে গেছে।
অ্যাঁ!
হ্যাঁ, ওই যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলে তারই চোটে সায়াটিকা উধাও হয়ে গেছে।
আশ্চর্য ব্যাপার।
হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।
কিন্তু সব হলেও চাকরিটা তো আর থাকছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অঘোরবাবুর খুব দুঃখ হয়। দিব্যি বাঁধা চাকরি ছিল। বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার পর আর কোনো আশা নেই।
অঘোরবাবু যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, একটু পায়চারি-টায়চারি করতে পারছেন তখন একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ির সামনে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে এক লালমুখো বিশাল সাহেব নেমে এল। অঘোরবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু অল্পবয়সি সাহেবটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দ করতে লাগল যে সেই ভীম আলিঙ্গনে অঘোরবাবুর প্রাণ যায় আর কী।
তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সাহেব বলল, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপাতত তোমাকে তিন গুণ প্রমোশন দিয়ে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করে নিচ্ছি। তোমার দু-হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়িও দেওয়া হবে।
অঘোরবাবু স্বপ্ন দেখছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখলেন, জেগেই আছেন। তাহলে এসব কী হচ্ছে?
সাহেব নিজে থেকেই বলল, তোমার মতো গুণী মানুষ দেখিনি। টাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। টাকের জন্য কত ওষুধ খেয়েছি, কত চিকিৎসা করেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু তুমি সেদিন আমার মাথায় কী একটা ওষুধ ঢেলে দিয়ে এলে, এই দেখো এখন আমার মাথাভরতি সোনালি চুল।
তাই বটে! ইনি তো বড়ো সাহেবই বটে। মাথাভরতি চুল হওয়ায় এতক্ষণ চিনতে পারেননি অঘোরবাবু। গদগদ হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

কালাচাঁদের দোকান

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে-সেখানে বদলি হয়ে যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ-স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, 'আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসা ভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাপু!'

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?'

গিন্নি বললেন, 'ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এরপর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।'

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, 'একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।'

বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবার এক শীতের সন্ধেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছোলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুরগাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পথ পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা-বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালোও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাঁইনাড়া হতে হবে না। ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে, এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, 'কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর! অসুখ হলে ডাক্তার-বদ্যি পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?'

নবীনবাবু বললেন, 'বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দু-দিন হাট।'

'তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?'

'ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে!'

'জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না-করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।'

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কী আর করা! নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে।'

প্রথমদিন বাজার করতে দু-ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারীদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালোও নয়। পাওয়া যায় না

সব কিছু।
বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, 'আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ-জায়গায় মানুষ থাকে? মা গো!'
নবীনবাবু ফাঁপরে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।
একদিন সন্ধেবেলা গিন্নি এসে বললেন, 'ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?'
'দেখো না একটু খুঁজেপেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটোখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।'
অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডানহাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঠাহর করে দেখলেন, একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপানা কণ্ঠধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, 'আজ্ঞে আসুন।'
নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, 'আছে। ভালো ঘানির তেল।'
'কত দাম?'
লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, 'দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ-টাকা করেই দেবেন।'
নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু-ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, 'বা:, এ তো দারুণ ভালো তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?'

সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, 'আছে। ভালো ঘানির তেল ।'

নবীনবাবু বললেন, 'আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড়ো ভালো।'
লোকটা যে সত্যিই ভালো তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু-দিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, 'আপনাকে দাম দিতে হবে না।'
নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নামই তো জানি না এখনও।'
'আজ্ঞে কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।'
'আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?'

'যে আজ্ঞে। তবে সন্ধের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও-সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।'
দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, 'ওগো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলে-মেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?'
কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনোমনো করে গেলেন।
কালাচাঁদ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরমমশলা।'
'দাম?'
'দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।'
নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, 'ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ো তো! দরকারমতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁগো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাসবাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায় কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, বলল, 'সাতজন্মে কালাচাঁদের দোকানের কথা শুনিনি।'
'হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলবখন।'
দু-দিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের পুরোনো?'
কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, 'তা কম হবে না। ধরুন, এ-গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।'
নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরোনোই হবে তাহলে দাস-গিন্নি এ-দোকানের কথা শোনেনি কেন?
কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, 'এ-গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।'
'আচ্ছা, তাই হবে।'
পরদিন নবীনবাবু এক বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, 'হ্যাঁগা, তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়োন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল, 'নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে।'
নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, 'কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।'
পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু একথা-সেকথার পর কালাচাঁদকে বললেন, 'তা কালাচাঁদবাবু, আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।'
কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।'
'ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ-দোকানের কথা জানে না।'
কালাচাঁদ তেমনই মৃদুমৃদু হেসে বলে, 'জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'
নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরদুর করে উঠল। বললেন, 'হ্যাঁ, তা আমি তো আমিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো খদ্দের কখনো দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?'
কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, 'একজনের জন্যই তো দোকান।'
'অ্যাঁ!'
কালাচাঁদ হাসল, 'আসবেন।'

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়?'

'পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।'

'তাড়া কীসের?'

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, 'না না, অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দু-দিন পর হলেও চলবে। বসুন, একটু সুখ-দুঃখের কথা কই। টাকাপয়সার কথা থাক।'

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন! পাঁচ টাকা পাওনা! বলে কী লোকটা? তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারী জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাকসবজিও ক্রমে-ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছমাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকেরও ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, 'ওগো, নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।'

'দিয়ো না। হ্যাঁগো, কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো! আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?'

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, 'না, না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কী সব সয়?'

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

হনুমান ও নিবারণ

নিবারণবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উটকো উৎপাত তিনি পছন্দ করেন না। তবু তাঁর কপালেই হালে এক ঝামেলা এসে জুটেছে। বাড়ির সামনেই একখানা পেল্লায় জামগাছ। সেই গাছে দু-তিন দিন আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশাল জাম্বুবান কেঁদো হনুমান এসে থানা গেড়েছে। এ তল্লাটে হনুমান, বাঁদর ইত্যাদি কোনো কালেই ছিল না। হনুমানটা যে কোথা থেকে উটকো এসে জুটল তা কে জানে!

তা হনুমান আছে থাক, নিবারণবাবুর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। হনুমান হনুমানের মতো থাক, তিনি থাকবেন তাঁর মতো। কিন্তু এই ব্যাটাচ্ছেলে হনুমান কী করে যেন টের পেয়েছে যে, এ পাড়ায় সবচেয়ে নিরীহ ভালো মানুষ হল এই নিবারণ ঘোষাল। হতচ্ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না, কারও দিকে দৃকপাত অবধি নেই। কিন্তু নিবারণবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেই জামগাছে তুমুল আলোড়ন তুলে হুপহাপ দুপদাপ করে দাপাদাপি করতে থাকে।

প্রথম দিকের ঘটনা। শান্ত শরৎকালের মনোরম সকাল। সোনার থালার মতো সূর্য উঠেছে। চারদিকে একেবারে আহ্লাদি রোদ। একটানা কোকিলও কুহুস্বরে ডাকছিল। নিবারণবাবু থলি হাতে প্রশান্ত মনে বাজার করতে বেরিয়েছেন। দুর্গানাম স্মরণ করে চৌকাঠের বাইরে সবে পা রেখেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জামগাছটায় ওই তুমুল কান্ড। নিবারণবাবু সভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ভারি ভীতু লোক। গিন্নি বললেন, কী হল, ফিরে এলে কেন?

নিবারণবাবু আমতা আমতা করে বললেন, জামগাছে কী যেন একটা কান্ড হচ্ছে।

গিন্নি হেসে বললেন, ও তো একটা হনুমান। কাল আমিও দেখেছি। পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল মারছিল।

নিবারণবাবু একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলো। হনুমান। জামগাছতলা দিয়েই রাস্তা আর রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাতায়াত করছে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, বাজারমুখো এবং বাজারফেরত মানুষ, ঝাড়ুদার। হনুমান কাউকে দেখেই উত্তেজিত নয়, কিন্তু যেই নিবারণবাবু ফের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন অমনি লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেল। নিবারণবাবু তখন সাহসে ভর করে একটু দৌড় পায়েই জামগাছটা পেরিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কেন যেন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

তবে সেদিন বাজারে গিয়ে মনটা ভারি ভালো হয়ে গেল। সস্তায় বেশ বড়ো বড়ো পাবদামাছ পেয়ে গেলেন। মরশুমের প্রথম ফুলকপি একটু দর করতেই দাম নেমে গেল, আর একআঁটি ধনেপাতা কিনে ফেললেন মাত্র চার আনায়। বাজার সেরে যখন ফিরছেন তখন আর হনুমানটার কথা তাঁর খেয়াল নেই। যেই আনমনে জামগাছটার কাছাকাছি এসেছেন অমনি ডালপালায় তুমুল শব্দ করে হনুমানটা নেমে এল একেবারে নীচে। একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজখানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয়-ছোঁয়। নিবারণবাবু জীবনে দৌড়ঝাঁপ বিশেষ করেননি, তবু হনুমানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সেদিন এমন দৌড় দিলেন যে তাঁর ছোটোছেলে বিশু অবধি পরে প্রশংসা করে বলেছিল, বাবা, তুমি যদি সিরিয়াসলি দৌড়োতে তাহলে অলিম্পিক থেকে প্রাইজ আনতে পারতে। চটি-পরা পা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে যে কেউ অমন দৌড়োতে পারে তা চোখে না-দেখলে বিশ্বাস হত না।

দৌড়টা যে ভালোই হয়েছিল তা নিবারণবাবুও জানেন, তবে শেষ অবধি চটিজোড়া পায়ে ছিল না, ছিটকে পড়েছিল। আর বাজারের ব্যাগ হাতছাড়া হয়ে সাধের পাবদামাছ চারটে কাকে নিয়ে গেল, ছ-খানা ডিম

ভাঙল আর রাস্তার একটা গোরু দু-খানা ফুলকপি চিবিয়ে খেয়ে নিল।
দ্বিতীয়বার ঘটনাটা ঘটল অফিসে বেরোনোর সময়। নিস্তব্ধ জামগাছতলা দিয়ে বিস্তর লোক বিষয়কর্মে যাচ্ছে-আসছে। কিন্তু টিফিনকৌটা ছাতা বাগিয়ে গালে পানটি পুরে দুর্গানাম স্মরণ করে যেই নিবারণবাবু বেরোলেন অমনি জামগাছে যেন ঝড় উঠল। হনুমানটা এডালে-ওডালে ভীষণ লাফালাফি করতে করতে হুপহাপ করে বকাঝকাই করতে লাগল বোধহয়।
কিন্তু অফিসে তো আর কামাই করা যায় না, নিবারণবাবু ছাতাখানা ফট করে খুলে তার নীচে আত্মগোপন করে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন, জামগাছটা পেরোনোর সময় হনুমানটা তাঁর ছাতায় একটা খাবলা মারল।
গত তিনদিন ধরে নিবারণবাবুর জীবনে আর শান্তি নেই। আসতে হনুমান, যেতে হনুমান। হনুমানটা কেন যে শুধু তাঁর পিছনে লাগছে তা চিন্তা করে করে তিনি হয়রান। খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন না, তিনদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে কানু আর বিশু হনুমানটাকে তাড়ানোর জন্য বিস্তর ঢিল আর গুলতি ছুড়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। হনুমানটা গাছের মগডালে উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। ইট-পাটকেল তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজ্‌খানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয়-ছোঁয়...

গিন্নি বললেন, পূর্বজন্মে ও তোমার ভাই ছিল, তাই এত টান। নিবারণবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হনুমানের ভাই হতে আমি যাব কেন?
দুশ্চিন্তা নিয়েই নিবারণবাবু রাতে শুয়েছেন। তবে ঘুম আসছে না। মাথাটা বেশ গরম। কাল সকালেই আবার বাজার আছে, অফিস আছে। জামগাছতলা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছেন। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে পুরী বা ওয়ালটেয়ার ঘুরে আসবেন কিনা তাও ভাবছেন। হঠাৎ একটা বিকট হুপ শব্দে নিস্তব্ধ রাতটা যেন কেঁপে উঠল। নিবারণবাবু চমকে উঠে বসলেন আতঙ্কে। অন্ধকার ঘর, তবু জানলার দিকে চেয়ে তাঁর বুক হিম হয়ে গেল। জানলাটা অর্ধেক ভেজানো ছিল। এখন জানলাটা পুরো খোলা। আর গ্রিল ধরে সেই অতিকায় হনুমানটা দাঁড়িয়ে। দু-খানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।
ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেলেন নিবারণবাবু যে, কাউকে ডাকতে পারলেন না, গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না তাঁর। কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলেন।
হঠাৎ একটা বেশ ভরাট গমগমে গলা বলে উঠল, ভয় পাবেন না...ভয়ের কিছু নেই...
বিস্ময়ে হতবাক নিবারণবাবু কে কথা বলল, তা চারদিকে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কারও থাকার কথা নয়। কণ্ঠস্বরটি ফের বলে উঠল, রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর দূত মাত্র।

নিবারণবাবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্বপ্ন দেখছেন কিনা তা বুঝবার জন্য হাতে একখানা রামচিমটি কেটে নিজেই উঃ করে উঠলেন।
গলাটা বলল, স্বপ্ন নয়। যা দেখছেন, যা শুনছেন সব সত্যি। নিবারণবাবু হনুমানের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কথাগুলো কি আপনিই বলছেন? মানুষের ভাষায়?
আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিশেষ নেই। রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে ভালোবাসেন না।
রামচন্দ্র কে?
আমার প্রভু।
কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?
আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।
ও বাবা! আমি পারব না, আমার বড়ো ভয় করছে।
ভয় কীসের?
আমার ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।
গোলমালের কিছু নেই। চলে আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।
নিবারণবাবু বুঝলেন, এসব ভূতুড়ে কান্ড। এবং বেশ জবরদস্ত ভূতের পাল্লায় তিনি পড়েছেন। তবে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। তিনি ঘুমন্ত গিন্নিকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে কানু আর বিশুকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। সে এমন রামধাক্কা আর বিকট চেঁচানি যে মরা মানুষেরও উঠে বসবার কথা। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দই পেলেন না।
হনুমান বলল, ওদের ঘুম এখন ভাঙবে না। বৃথা চেঁচামেচি করছেন।
ভয়ে নিবারণবাবুর শরীর প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তার ভয়ে আবার কলকল করে ঘাম হতে লাগল। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে যে, হার্টফেল হওয়ার জোগাড়।
ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, এসব আমার ভালো লাগছে না।
নিবারণবাবু শুয়ে পড়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলেন।
হনুমান বলল, নিবারণবাবু, প্রভুর হুকুম তামিল না-করে আমার উপায় নেই। আপনি সহজে না-গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।
এই বলে হনুমান চুপ মারল। নিবারণবাবু চোখ মিটমিট করে দেখতে পেলেন, হনুমান দু-হাতে গ্রিল ধরে টানাটানি করছে। শক্ত লোহার গ্রিল, ভাঙতে পারবে বলে মনে হল না নিবারণবাবুর।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হনুমান মাত্র একটা হ্যাঁচকা টানেই পুরো গ্রিলটা জানালার ফ্রেম থেকে উপড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলল।
নিবারণবাবু এত ভয় পেয়েছেন যে, আরও বেশি ভয় পাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মজা হল ভয় যখন সাংঘাতিক বেশি হয় তখন মানুষের একটা মরিয়া সাহসও আসে। চোর তাড়ানোর জন্য খাটের মাথার কাছে একখানা মোটা বেতের লাঠি রাখা থাকে। আজ অবধি সেটা কোনো কাজে লাগেনি। আজ লাগল। নিবারণবাবু ভাবলেন, এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি, সুতরাং আর ভয়ের কী? যা থাকে কপালে— ভেবে লাফিয়ে উঠে তিনি লাঠিটা নিয়ে প্রবল বিক্রমে হনুমানের মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বসালেও লাঠিটা ঠিকমতো বসল না। হনুমান খুব আলগা হাতে লাঠিটা কেড়ে নিল হাত থেকে, তারপর সেটাকে প্যাঁকাটির মতো ভেঙে ফেলে বলল, কেন ঝামেলা করছেন? প্রভু রামচন্দ্র ডাকছেন, এ আপনার মহাসৌভাগ্য।
নিবারণবাবু যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হনুমানটা লম্বায় প্রায় তাঁর সমান। আর চওড়ায় কুস্তিগিরদের মতো। এত বড়ো হনুমান তিনি এর আগে আর দেখেননি। বিপদে পড়ে মাথাটা একটু গন্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি হনুমানের কথাগুলো শুনেও বুঝবার চেষ্টা করেননি। এবার তাঁর হঠাৎ মনে হল, এ কী সেই রামচন্দ্রের হনুমান নাকি? হনুমান তো অমর, তার এখনও পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে

থাকবার কথা। আর প্রভু রামচন্দ্র — তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে এসব হচ্ছেটা কী? রামচন্দ্র তাঁর ভক্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ডাকবার জন্য? কিন্তু কেন? তিনি তো তেমন উঁচুদরের ভক্ত বা ধার্মিক নন!

হনুমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, আমার লেজটা ধরুন।

ভয়ে ভয়ে নিবারণবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে লেজটা ধরলেন আর ধরতেই যেন চৌম্বক আকর্ষণে হাত দুটো লেজের সঙ্গে আটকে গেল। আর দাঁড়ানোর উপায় রইল না।

তারপর যে কী হল তা নিবারণবাবু ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। হনুমান তাঁকে জানালা গলিয়ে বাইরে এনে ফেলল এবং তারপর ইঞ্জিনের মতো ছুটতে শুরু করল। এত ছুট জীবনে কখনো ছোটেননি নিবারণবাবু। তবে কেন যেন তাঁর হাফ ধরছিল না। চোখের পলকে নিজেদের তল্লাট এবং শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠঘাটে এসে গেলেন তাঁরা। হনুমান মস্ত মস্ত লাফ মেরে ঢেউয়ের মতো চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দশ-বারো হাত দূরে দূরে এক-একবার পা মাটিতে ঠেকছে।

অনেকটা চলে আসার পর একটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তাঁরা। তারপর একটা ফাঁকা চত্বর। জঙ্গলঘেরা জায়গাটায় একটা লোক পিছনে হাত রেখে মৃদুমন্দ পায়চারি করছে। লোকটা বেঁটে এবং দেখতে একটু কিম্ভূত। পরনে একটা পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো পোশাক, মাথায় একটা সরু টুপি। লোকটার গোল মুখখানায় চোখ-নাক-কান কোনোটাই ঠিক জায়গায় নেই বলে মনে হল দূর থেকে।

কাছে গিয়ে হনুমান লোকটাকে প্রণাম করে বলল, প্রভু, এনেছি।

লোকটা নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, মুখটা ভালো করে দেখে আঁতকে উঠলেন নিবারণবাবু। এর চোখ দুটো দুই গালে। ঠোঁট দুটো নাকের ওপরে। আর গলা বলে কিছু নেই। কান দুটো গোরুর কানের মতো। এই কী রামচন্দ্র? এত বিচ্ছিরি দেখতে?

রামচন্দ্র লোকটা ডান গালের চোখটা দিয়ে নিবারণবাবুকে দেখে নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, পেন্নাম করলে না?

যে আজ্ঞে! বলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র খকখক শব্দ করে হেসে বললেন, শোনো হে বাপু, আমি সত্যিই কিন্তু তোমাদের সেই রামায়ণের রামচন্দ্র নই। তার গল্পটা বেশ লাগে, তাই ভাবলুম রামচন্দ্র নামটা নিলে মন্দ হয় না।

আপনি আসলে কী তাহলে?

লোকটা মাথাটা একটু নেড়ে বলে, সে বাপু অনেক কথা। তবে সোজা কথায় আমি এ তল্লাটের লোক নই, এই দেশের, এমনকি এই হতচ্ছাড়া নোংরা গ্রহেরও নই। অনেক দূরের পাল্লা রে বাপু। আর আমার এই হনুমানটিও আসল হনুমান নয়। কলের হনুমান। তবে কল হলেও ও বড়ো খুঁতখুঁতে, সবাইকে পছন্দ করে না। দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মাত্র একটা লোককেই ও বেছে বের করেছে। সে হল তুমি।

নিবারণবাবু ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছিলেন। প্রত্যয় হচ্ছে না। যা শুনছেন সব সত্যি নাকি? এসব তো কল্পবিজ্ঞানে থাকে।

রামচন্দ্র বলল, তোমাদের গ্রহটা নোংরা হলেও মহাকাশে আমার কাজের পক্ষে সুবিধেজনক। আমার হনুমানকে তাই তোমাদের গ্রহে পাকাপাকিভাবে রেখে যেতে চাই। সমস্যা হল, ওকে ঠিকমতো দেখাশোনা করার লোক চাই। ও তোমাকে খুঁজে বের করেছে, কাজেই ওর ভার তোমাকেই নিতে হবে। নিবারণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, যে আজ্ঞে, তবে কেমন যত্নআত্তি করতে হবে?

খুব সোজা, ওর মাথায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, চাঁদির একেবারে মাঝখানে। এই তেলের কৌটোটা নাও, মাসে একবার ওই ফুটোর মধ্যে দু-ফোঁটা তেল ঢেলে দিলেই হবে। আর তোমার বাড়ির জামগাছটাতেই ও থাকবে। ওকে যেন কেউ বিরক্ত না-করে দেখো। বেশি বিরক্ত করলে কিন্তু ও গা থেকে এমন রশ্মি বের করতে পারে যা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

নিবারণবাবু শিউরে উঠে বললেন, যে আজ্ঞে।

আর তুমি ইচ্ছে করলে ওকে ফাইফরমাশ করতে পারো, ওর সঙ্গে হিল্লি-দিল্লি বেড়িয়ে আসতে পারো।
নিবারণবাবু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, যে আজ্ঞে।
তাহলে এসো গিয়ে। কোনোরকম গোলমাল কোরো না কিন্তু।
আজ্ঞে না।
লোকটা অর্থাৎ রামচন্দ্র গটগট করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শিস দিল। অমনি মাটির তলা থেকে একটা কিম্ভূত পটলাকৃতি মহাকাশযান বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।
নিবারণবাবু এখন বেশ আছেন। হনুমানটা জামগাছেই থাকে। তবে তাকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মাঝরাতে হনুমানটা এসে তাঁর সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিয়ে যায়। ঘরের কাজকর্মও অনেক করে দেয়। গিন্নি তো পছন্দ করেনই, বিশু আর কানুরও সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে। হনুমানকে তেল দিতে নিবারণবাবুর একবারও ভুল হয় না।

জয়রামবাবু

জয়রাম বোস নস্যির ডিবেটা মঙ্গলগ্রহে ফেলে এসেছেন। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। তাড়াহুড়োয় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য যে-রকেটটা ভাড়া করেছেন, সেটা আন্তঃনক্ষত্রমন্ডল খেয়া পারাপারের। সৌরমন্ডলের জন্য আলাদা ধীরগতির রকেট পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরার সময় এটাকেই কাছেপিঠে দেখতে পেয়ে হাতঘড়িতে লাগানো ট্রান্সরিসিভারের সংকেতে নামিয়ে এনেছিলেন। পাইলট ফাঁকতালে ছোটো খেপের সওয়ারি পেয়ে কিছু বাড়তি লাভের আশায় আপত্তি করেনি বটে, তবে সে নস্যির ডিবের জন্য এখন ফিরে যেতেও নারাজ। জয়রাম কথাটা তুলতেই লোকটা বলল, 'ও বাবা, আমাকে আর সাত মিনিটের মধ্যে নেবুলার ওধারে রওনা হতে হবে। আমার এ রকেট সেকেণ্ডে মাত্র দু-কোটি মাইল যায়। সৌরমন্ডল বলে আরও আস্তে চালাচ্ছি। দেরি করতে পারব না।'

জয়রাম খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই। আন্তঃনক্ষত্রমন্ডল খেয়ার মাঝিরা একটু ডাঁটিয়াল হয়েই থাকে। তবে নস্যির ডিবের জন্য জয়রামের একটু উশখুশ রয়েই গেল।

জয়রামের বাড়ি একটি ভাসমান বাসগৃহ। পৃথিবীতে আর বাড়ি করার জায়গা নেই। মাটির তলাতেও আধমাইল গভীরতা পর্যন্ত গিজগিজ করছে বাড়িঘর। অবশেষে একবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধী বাড়ি তৈরি করে আকাশে ছাড়া হয়েছে। তা বলে বাড়িগুলো ভেসে বেড়ায় না, শূন্যের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একদম স্থির হয়ে থাকে। এইসব বাড়িতে বাতাস থেকে জল এবং সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভালো ব্যবস্থা আছে। শুধু মাঝে-মাঝে হাটবাজার করতে পৃথিবীতে নামতে হয়।

জয়রামের বাড়ির সামনে একটা খোলা রক। তার ওপর দাগ কেটে জয়রামের ছোটো মেয়ে বুঁচি এক্কাদোক্কা খেলছে। রকেটটা সেই রকের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই জয়রাম ভাড়া মিটিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন। বুঁচি 'বাবা' বলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে।

মেয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ায় জয়রাম টাল সামলাতে না-পেরে পড়ো-পড়ো হয়ে পড়েই গেলেন নীচে। নীচে বলতে যদি সত্যিই পৃথিবীর বুকে গিয়ে পড়তে হয়, তবে সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফুট। কিন্তু আকাশবাড়িতে যারা থাকে তাদের সকলকেই মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধী পোশাক পরতে হয়। জয়রাম তাই পড়েও পড়লেন না। শূন্যে একটু ভেসে সাঁতরে আবার বাড়ির রকে এসে উঠলেন। মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ঘরে ঢুকে মহাকাশের বিশেষ পোশাক ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে দেয়ালজোড়া টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে বললেন, আমি এখন টেলিভিশন দেখব। চ্যানেল চার, ব্যাণ্ড সাত। বলার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি-প্রতিক্রিয়ায় টেলিভিশনে ছবি ভেসে উঠল। জোর খেলা চলছে। বৈজ্ঞানিক রাখোহরির টিমের সঙ্গে যন্ত্রবিদ ফসটারের টিমের ফুটবল ক্যালকুলেশন ম্যাচ। দু-দলে এগারো জন করে বাইশ জন বাঘা কম্পিউটার রয়েছে। তারা বলটাকে এক বিশাল আয়তক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় চালনা করছে। রাখোহরির লেফট উইং বেঁটে কম্পিউটার গদাই বলটকে নিউট্রাল জোনে ঠেলে দিতেই ফসটারের গোল কম্পিউটার ব্যারেল সেটাকে ধরে লেফট হাফ মজবুত-গড়নের গরডনের কাছে পাঠাল। রাখোহরির চকিত-চিন্তা কম্পিউটার বলটাকে ধরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কোণে নিখুঁত ঠেলে দিতেই ফসটারের পাগলা কম্পিউটার মুনস্ট্রাক আর রাখোহরির ঠাণ্ডা মাথার কম্পিউটার শীতলচন্দ্রের জোর সংঘর্ষ।

জমে উঠেছিল খেলাটা। কিন্তু জয়রামের গিন্নি সৌরচুল্লিতে কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর একবাটি সুজি করে এনে দিয়ে বললেন, 'এক ছিটে আনাজপাতি নেই। বাজারে যাবে না?'

জয়রাম উঠলেন। অতিবেগুনি রশ্মি ও অন্যান্য রশ্মি দিয়ে হাতমুখ পরিষ্কার করে সুজি খেয়ে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লেন। আসল সুজি নয়, কৃত্রিম সুজি, তাই মুখটা বিস্বাদ ঠেকছিল।
গ্যারেজে ঢুকে ছোটো ভারটিকাল বিমানটি বের করে নিয়ে পৃথিবীর বুকে রওনা হলেন। তাড়া নেই। আস্তে-আস্তে যাচ্ছেন। আশেপাশে আরও অনেক বাড়ি ভাসছে। দত্তগিন্নি একটা মহাজাগতিক রশ্মি আটকানোর ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে ডালের বড়ি শুকোতে দিচ্ছেন। বুড়ো চাটুজ্যের বড়ো বদভ্যাস। রকে দাঁড়িয়ে নাক ঝাড়ল নীচে। পড়শি খলিলভাই বাজার করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে একটা কাচের হেলিপ্লেনে ফিরছিল। তাকে বেতারে জয়রাম চাটুজ্যেবুড়োর বদভ্যাসের কথাটা জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইভাবেই একদিন দেখো আকাশবাসী আর পৃথিবীবাসীর মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠবে। এখনই সাবধান না-হলে...'
নস্যির জন্য নাকটা উশখুশ করছে তখন থেকে। কিন্তু কিছু করার নেই। দুঃখিত মনে জয়রাম প্লেন নিয়ে নিউইয়র্কের সুপার মার্কেটে নামলেন। নামে সুপার মার্কেট হলেও সবজি বা আনাজ বলতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চাষের জমিতে টান পড়েছে। তাই টাটকা সবজির বদলে আজকাল সিনথেটিক খাবারেরই বেশি চলন, সবজি যাও বা কিছু পাওয়া যায়, তা আসে নীহারিকাপুঞ্জের প্রথম পর্যায়ের এক সৌরমন্ডলের দুটি বাসযোগ্য বড়ো গ্রহ থেকে। কিন্তু তাতে খরচও কম পড়ে না, আর পরিমাণেও তা পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ।
জয়রাম ভিড়ে থিকথিক-করা বাজারে ঢুকে দেখলেন একজায়গায় কিছু টাটকা মানকচু বিক্রি হচ্ছে। তার সামনে বিশাল লাইন। জয়রাম ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু অর্ধেক পথেই কচু ফুরিয়ে গেল। ছুটলেন অন্য জায়গায়, সেখানে কিছু তেলাকুচোর চালান এসেছে। কিন্তু তেলাকুচোও কপালে জুটল না। নস্যির জন্য নাকটা সুড়সুড় করছে কখন থেকে। মঙ্গলগ্রহে হাজার হাজার বিল-খাল খোঁড়ার কাজ তদারক করতে করতে অন্য সব কথা খেয়াল থাকে না। অথচ খাঁটি নস্যি এখানে কিনতেও পাওয়া যায় না। নীহারিকাপুঞ্জের সবুজ গ্রহে কিছু তামাকের চাষ হয়। সেখান থেকে তাঁর বন্ধু পাড়ুরাম বড়ো একটা ডিবে এনে দিয়েছিল। দামও পড়ে যায় বিস্তর।
কাঁচা সবজি না-পেয়ে জয়রাম টিনের সিল করা প্যাকে কৃত্রিম খাবার কিনলেন। গিন্নি ভারি রেগে যাবেন। কিন্তু কী আর করা!
ছাদের দিকে এসকেলেটরে উঠছেন এমন সময় দোকলবাবুর সঙ্গে দেখা।
'কী খবর হে? বাসা কোথায় করলে?' দোকলবাবু জিজ্ঞেস করলেন।
'আজ্ঞে আকাশপুরীর তায়েবগঞ্জে। উত্তর রাশিয়ার ঠিক ওপরেই।'
'বা:,সে তো খুব ভালো জায়গা শুনেছি। এখন সেখানে জায়গার দাম কত করে বলো তো? আমার মেজোজামাই জায়গা খুঁজছে।'
'আজ্ঞে তায়েবগঞ্জে আর জায়গা নেই। পাশে নতুন একটা কলোনি হচ্ছে। নাম চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপ সেখানে জায়গা পেয়ে যাবেন। তবে প্রতি ঘনফুট বোধ হয় পাঁচ লক্ষ ডলার করে পড়বে।'
'তা পড়ুক। জায়গা পাওয়া গেলেই হল।' বলতে বলতে দোকলবাবু পকেট থেকে একটা রুপোর কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে 'আঃ' বলে আরামের একটা আওয়াজ করলেন।
ডিবেটার দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়েছিলেন জয়রামবাবু। এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। নস্যি, নস্যি!
'একটু দেবেন? ওই নস্যিটা?'
দোকলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও না। আমার বড়োজামাই তো সবুজ গ্রহে কাজ করে, সে আমাকে পিপে-পিপে নস্যি পাঠায়। যত খুশি নাও।' বলে দোকলবাবু উঁকি মেরে জয়রামের থলিটা দেখে বললেন, 'শাকসবজি কিছু পেলে না দেখছি!'

জয়রাম পরপর দু-টিপ নস্যি টেনে আরামে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে একগাল হাসলেন। বললেন, 'না:। গিন্নির কাছে আজও বকুনি খেতে হবে।'
ছাদে এসে যে-যার যানবাহন খুঁজতে যাবেন, তখন দোকলবাবু বললেন, 'এখনও ঢের সময় আছে। আমার বাড়ি তো কাছেই গ্রিসে। চলো একটু বিশ্রাম করা যাবে।'
নিউইয়র্ক থেকে গ্রিসের দূরত্ব এয়ারকারে মাত্র আধ মিনিট। তাই জয়রামবাবু আপত্তি করলেন না। দোকলবাবু তাঁর এয়ার-কারের দরজা খুলে বললেন, 'উঠে পড়ো।'
পুরোনো অ্যাথেন্সের বাইরে দোকলবাবুর ছোট্ট বাড়ি। তবে খুব বড়োলোক ছাড়া বাড়িতে কারও বাড়তি জমি থাকে না। দোকলবাবুর আছে। কাজটা বেআইনিও বটে। দোকলবাবু খুব লুকিয়ে পাঁচিল ঘিরে দশ হাত বাই দশ হাত একটু জমি রেখেছিলেন বাড়ির পিছনে।
জয়রামকে কফি খাইয়ে দোকলবাবু বললেন, 'এসো, তোমাকে তাজ্জব জিনিস দেখাব একটা।' বলে প্রায় হাত ধরে টেনে পিছনের ফালি জমিটায় নিয়ে এলেন জয়রামকে।
জয়রাম থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে থ তিনি।

'ঢেঁকিশাক!' জয়রাম চেঁচিয়ে উঠলেন ।

পৃথিবীতে অতীত কালের মানুষরা মাটিতে কেমিক্যাল সার দিয়ে মাটিকে পাথরের মতো শক্ত আর জমাট করে দিয়ে গেছে। তাতে আর চাষ হয় না, সেচ চলে না, লাঙলই ঢুকতে চায় না। গাছপালা বলে কিছুই প্রায় নেই। ফালতু জমিও নেই যে গাছ লাগানো যাবে। তবে এ কী? দশ বাই দশ হাত জায়গাটায় কচি কচি ঢেঁকিশাকের মাথা জেগে রয়েছে। কী সবুজ! কী সরস! কী অদ্ভুত!
'ঢেঁকিশাক!' জয়রাম চেঁচিয়ে উঠলেন।
দোকলবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, 'উহুঁ, শব্দ করো না। টের পেলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে।'
জয়রাম এবার চাপাস্বরে প্রচন্ড উত্তেজনায় বলে উঠলেন, 'এ যে ঢেঁকিশাক!'
'ঢেঁকিশাকই বটে। অনেক কষ্টে দশ বছরের চেষ্টায় ফলিয়েছি। নেবে ক-টা? নাও। দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি। খবরদার, কাউকে বোলো না কিন্তু!'
'আজ্ঞে না না।' বিগলিত জয়রাম বললেন।
'আর শোনো, ওই চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপে আমার জামাইয়ের জন্যে শ-পাঁচেক ঘনফুট জায়গা জোগাড় করে দিতে হবে।'
ঢেঁকিশাকের দিকে চেয়ে জয়রাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'
বারোগাছি ঢেঁকিশাক নিয়ে জয়রাম যখন বাড়িতে ফিরলেন, তখনও তাঁর চোখমুখ অস্বাভাবিক সম্মোহিত। বিড়বিড় করে কেবল বলছেন, 'ঢেঁকিশাক! ঢেঁকিশাক!'

ডবল পশুপতি

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালোমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মনটা বড়ো ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তাহলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়।

পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময় বেশ ভালোই ছিল। তাঁর ঠাকুরদা পুরোনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো-মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহুলোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডনবৈঠক দেন, কল-ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকাপয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোটো লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবু ভালোই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'এই যে পশুপতিবাবু নমস্কার। কেমন আছেন?' তখন পশুপতিবাবুর ভারি সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, 'বোধহয় ভালোই।' কিংবা, 'মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।' অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, 'পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?'

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না-দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুক-ডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু 'হুম, হুম' শব্দ করতে লাগলেন!

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিবাবুকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'ব্যায়াম করছেন? খুব ভালো। ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুণ্ডা-বদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।'

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সি রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুক-ডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন।

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন...

লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, 'লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহংকারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনো কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভালো দিকটাও দেখতে হবে, লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।'
পশুপতিবাবু রাগবেন কী খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।
লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, 'তা মহেন্দ্র তবু, বলে বসল, 'ওহে নিতাই, তোমার পুরোনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালোটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না।' পশুপতির আবার গুণটা কীসের? বাপ-পিতেমোর অত বড়ো বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না-পেয়ে কত কষ্টে এখানে-সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'
পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।
পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।
লোকটা বলল, 'আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু-কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটা দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই-পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্পকথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তাহলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।'
পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভুজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।
লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, 'আমি বলি কী, পশুপতিবাবু কী আর আমার প্রস্তাব ফেলতে পারবেন। তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বই কী। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, 'তুমি পারবে না হে নিতাই,' তখন আমিও বললুম, 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে

ভাববার সময় দিতে নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা-রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমি ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পুব-দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।'

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওলারাই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।'

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালোমানুষ হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। এ-লোকটা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন-চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদবেগে হুটোপাটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?'

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি,হইহট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতেও পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলার বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন-সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দুজন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু-হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকেই একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'পশুপতি এসে গেছ! বা:, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।'

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁ-হাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারি শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড়ো মেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজোছেলে এসে দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।
পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।
মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারি অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।
'কাজটা কি ঠিক করলে পশুপতিভায়া?'
পশুপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কোন কাজের কথা হচ্ছে।
নিতাই মাথা নেড়ে বলল, 'ভাড়া না-হয় আরও দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনো দরকার ছিল কি? কাজটা কি ঠিক হল হে পশুপতি?'
পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।
নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, 'আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।'
পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।
পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।
'বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো! ঢের-ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুড়ছিলেন? তাও ছোটোখাটো ঢিল নয়, এত বড়ো বড়ো পাথর। তারদু-খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কি পাগল না পাজি?'
পশুপতি এবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।
নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, 'আমিও দুর্গা-দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফের ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব।'
পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খেয়ে নেবেন দুপুরবেলাটায়।
সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'গায়ের জোর থাকলেই কি গুণ্ডামি করতে হবে ভাই?'
পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।
নিতাই বলল, 'না-হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বসলে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কি ঠিক? তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।'
পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।
নিতাই ধরা গলায় বলল, 'আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসেছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায় তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজোছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের মতোই, কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছ, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো না তা তো আর বেচারা জানত না।'
পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, 'বাবা রে মেরে ফেললে।' আর একজন বলে উঠল, 'এসব কি ঠিক কাজ হচ্ছে?' আর একজন, 'ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে!' আর একজন, 'আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ওমা!' সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, 'ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেলে চলে যাব আর জীবনে এমুখো হব না।'
পশুপতি ভাবতে ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন। সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।
পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনো কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।

বাঘের দুধ

তদানীন্তনবাবুর যে বাঘের সঙ্গে দিব্যি খাতির, তা লোকে জানে। খাতির মাগনা হয়নি। একবার নাকি পাতানাতা খুঁজতে ভুটভুটের জঙ্গলে ঢুকে ভারি ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। কানাওলা নামে একরকম ভূত আছে, তারা এমনিতে ফট করে কারও সামনে আসে না কিংবা শব্দ-সাড়াও করে না। তাদের কাজ হল মানুষের মগজে ঢুকে স্রেফ তার কাপাসটাকে অকেজো করে দেওয়া। ব্যস, সেই লোক আর কিছুতেই চেনা রাস্তাও চিনতে পারবে না, নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে দশবার যাতায়াত করেও বাড়ি ঠাহর করতে পারবে না, একেবারে ভজঘট্টে ব্যাপার বাধিয়ে দেবে। তা ভুটভুটের জঙ্গলে তেমনধারা কানাওলা বিস্তর ছিল। তদানীন্তনবাবু পড়লেন তারই একটার পাল্লায়। জঙ্গল থেকে আর কিছুতেই বেরোতে পারেন না। ওদিকে অন্ধকারও নেমে এল। আর সেই আমলে ডুয়ার্স ছিল এক উড্ডুটে জায়গা। ভূতপ্রেত দত্যিদানা তো ছিলই, আর ছিল বিস্তর বাঘ, হাতি, গন্ডার, বুনো শুয়োর, সাপখোপের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আর কে-না জানে, জঙ্গলের মধ্যে সন্ধেবেলার চেয়ে ভয়ের সময় আর নেই।

তদানীন্তনবাবু তখন ছোকরা মানুষ। সবে কবরেজিতে পসার হতে শুরু করেছে। ডাক্তার-কবরেজদের এই শুরুর দিকটাই যা বিপদের। প্রথম দিকেই দু-চারটে ভোজবাজি দেখিয়ে দিতে পারলে রুগির একেবারে গাদি লেগে যায় চেম্বারে। পসার হয়ে যাওয়ার পর রুগি মরলেও আর কেউ কিছু মনে করে না। যে-ক-টা ভালো হয়, সেগুলোর কথাই লোকে ফলাও করে বলে বেড়ায়। তা তদানীন্তনবাবু গোটা দুয়েক ভোজবাজি ইতিমধ্যে দেখিয়েছেনও। মহাজন রামপ্রসাদের পেটে একটা টিউমার হয়েছিল। ডাক্তার বলেছে, অস্ত্র করতে হবে। রামপ্রসাদ অস্ত্র করার নামে এমন ভয় খেয়ে গেল যে, তার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হল। সেই টিউমার শেষে কমল তদানীন্তনের দেওয়া ওষুধে। রামপ্রসাদ খুশি হয়ে বলল, 'তোমাকে কত দিতে হবে বলো, যা চাও তা-ই দেব।' কিন্তু লোভ তদানীন্তনের ধাতেই নেই। তার ওপর গুরুর বারণ আছে, চিকিৎসা মানে লোকসেবা, লোভ করতে যেয়ো না বাপু। তদানীন্তন তাই দুটি টাকা আর ওষুধের দামটুকু নিয়েছিলেন। এতে সবাই বেশ বাহবা দিল তাঁকে।

এরপর হেডপন্ডিতের বউয়ের ভূতে ধরার ঘটনা। সে-এক বিদঘুটে ব্যাপার। পন্ডিতমশাইয়ের গিন্নি রাখালরানি মহাখান্ডার। তাঁর ভয়ে বাড়ির বেড়ালটা অবধি তটস্থ। অমন যে দাপটের পন্ডিতমশাই, যাঁর ভয়ে ছাত্ররা একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকে, সেই-হেন পন্ডিতমশাই রাখালরানির কথায় ওঠেন-বসেন। রাখালরানিকে যে ভূতেরাও ধরার সাহস রাখে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। তবু ধরল, সবাইকে অবাক করে দিয়েই ধরল। আর কী ধরা বাপ। সাঁঝবেলায় পুকুরঘাটে গা ধুতে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন অন্য মানুষ। এক গলা ঘোমটা, নববধূর মতো হাবভাব, কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ ফুচফুচ করে কাঁদতে থাকেন, আবার যখন-তখন খিলখিল করে হেসে ওঠেন। অদৃশ্য সব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। গলা ছেড়ে বিদঘুটে সব গান গাইতে লাগলেন। একদিন দিনে-দুপুরে একটা মোষের পিঠে চেপে খানিকটা ঘুরে এলেন। এইসব কান্ড দেখে ডাক্তার-বদ্যি ডাকা হল। তারা ফেল মারলে ডাকা হল ওঝা। রাজ্যের লোক ভেঙে পড়ল কান্ডটা দেখতে। ওঝা যখন হার মেনে চলে গেল, তখন তদানীন্তনবাবুর ডাক পড়ল।

তা তদানীন্তনের কপাল ভালোই বলতে হবে। খুঁজেপেতে লাগসই গাছগাছড়া পেয়ে ওষুধ বানিয়ে ফেললেন। আর তা লেগেও গেল। সাত দিনের মধ্যে রাখালরানি আবার সেই আগের মতোই খাণ্ডারনি হয়ে উঠলেন। তদানীন্তনের বেশ নাম হল। শুধু কে জানে কেন, পন্ডিতমশাই বিশেষ খুশি হলেন না। কেবল বলতে

লাগলেন, ‘কবিরাজ না কপিরাজ, হুঁ:, উনি আবার চিকিৎসা করবেন, লোকচরিত্রই জানে না লোকটা! কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সেই জ্ঞানই হয়নি।’

তৃতীয় যে রুগি হাতে এল, তিনি বলতে গেলে এলাকাটার রাজা। শোনা যায়, নরহরিবাবুর একসময়ে নাম হয়েছিল থরথরি বলে। তা কথাটা মিথ্যেও নয়। নরহরি প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। তাঁর হাতে মেলা লোক মরেছে, মেলা লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে। যথেষ্ট টাকাপয়সা হাতে এসে যাওয়ার পর নরহরি ডাকাতি ছেড়ে ব্যাবসাতে মন দিলেন, জমিজায়গাও কিনে ফেললেন বিস্তর। তাতে অবস্থাটা ফুলেফেঁপে উঠল, খুব নামডাকও হল। এখন উনি ডাকাতি করেন না বটে, কিন্তু হাতে মাথা কাটেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ। একদিন তদানীন্তনকে ডেকে পাঠালেন দরবারে। বিশাল ঘর, ঝাড়বাতি, কিংখাব, কী নেই সেই ঘরে। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তদানীন্তনকে বললেন, ‘দেখো হে বাপু, ইদানীং মনে হচ্ছে আমি কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। এত টাকাপয়সা, ধনদৌলত, আমি বুড়ো হলে ভোগ করবে কে? অ্যাঁ! বুড়ো হব মানে? একী ইয়ার্কি নাকি? এখনও তেমন বয়সই হল না, বুড়ো হলেই হল? তা তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে...’

শুনে তদানীন্তন মাথা চুলকোলেন। বুড়ো হওয়াটা কোনো রোগ নয়, তবে অকালবার্ধক্য হলে অন্য কথা। তিনি যতদূর শুনেছেন, নরহরির বয়স সত্তরের ওপর, চুলে এখনও পাক ধরেনি, শরীরটাও টানটান আছে। একখানা ছোটোখাটো পাঁঠা, আস্ত কাঁঠাল বা সেরটাক রাবড়ি হাসতে হাসতে খেয়ে ফেলতে পারেন। কিলিয়ে পাথর ভাঙা নরহরির কাছে এখনও কিছু নয়। কিন্তু তা বলে তো আর জরা-বুড়ি ছাড়বে না। সে একদিন ধরবেই মানুষকে।

তদানীন্তনকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে নরহরি বললেন, ‘দেখো হে, রোগটা যদি সারাতে পারো তো তোমাকে আর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। রাজা করে দেব। আর যদি না-পারো তবে কী হবে, সেটা উহ্য থাক...’

তদানীন্তন বুঝলেন।

বুড়ো-হওয়া ঠেকানোর ওষুধ যে নেই, তা নয়। তবে বেশির ভাগ লোকই এটাকে রোগ বলে মনে করে না, চিকিৎসাও করাতে আসে না। আর ওষুধ জোগাড় করাও বেশ শক্ত। বাঘের দুধ, ব্রহ্মকমলের বীজ এবং আরও নানা দুষ্প্রাপ্য জিনিস লাগবে।

তদানীন্তন বললেন, ‘দেখি।’

‘দেখো, বেশ ভালো করে দেখো। এইটে তোমার অগ্নিপরীক্ষা, এই কথাটা মনে রেখেই কাজ কোরো বাপু।’

‘যে আজ্ঞে।’

এটা যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি তা বুঝতে কষ্ট হল না তদানীন্তনের। ভারি চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। তবে তিনি এটাও জানেন যে, নরহরির চিকিৎসা যদি লেগে যায়, তাহলে পসারের জন্য আর ভাবতে হবে না।

ভাবতে ভাবতে তদানীন্তন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। রোজ সকালে নরহরির দুটো যমদূতের মতো পাইক সড়কি হাতে এসে হেঁড়ে গলায় হাঁক মারে, ‘কই কবরেজমশাই, ওষুধ জোগাড় হল? বাবু যে হেদিয়ে পড়লেন। রোজ রাতে পনেরোখানা পরোটা খান, কাল রাতে চোদ্দোর বেশি পারেননি। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।’

তদানীন্তন কবিরাজ অমায়িকভাবে বলেন, ‘হচ্ছে বাবারা, হচ্ছে।’

তা দৌড়ঝাঁপ করে, নানা ফন্দিফিকির খাটিয়ে, কিছু কিছু জিনিস পেয়েও গেলেন তদানীন্তন। এখন বাঘের দুধটা হলেই হয়। কিন্তু সেটা কী হবে? কথাতেই আছে ‘বাঘের দুধ’। অভাবে গোরু বা মোষের দুধ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হবে না।

তা সে যা-ই হোক, নানা ভাবনাচিন্তায় পড়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বেঘোরে তো অন্ধকার নেমে এল। চারদিকে নানারকম জন্তুজানোয়ারের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। তদানীন্তন অগত্যা একটা বেশ বড়ো গাছে উঠে পড়লেন। বিশ হাতমতো উঠে তিনটে শাখার সংযোগস্থলে দিব্যি একটা রাত কাটানোর মতো ফাঁদালো

জায়গাও জুটে গেল। সেখানে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। পেটে খিদে, শরীরটার ওপর দিয়ে ধকলও গেছে কম নয়। তার ওপর কাঠপিঁপড়ে আর মশার কামড়েও জ্বালাতন হচ্ছেন।

ক্রমে রাত বেশ নিশুতি হয়ে এল। তদানীন্তনের একটু ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ শুনলেন, গাছের তলায় কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন কান্নাকাটি করছে বলে মনে হল। তবে মানুষ নয়।

তদানীন্তন অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে একটু ঝুঁকলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর ঘাড়ে একটা ধাক্কা মেরে টালমাটাল করে দিল।

হড়াস করে তদানীন্তন গাছ থেকে পড়লেন। তবে সোজাসুজি নয়। সোজা পড়লে ঘাড় ভেঙে যেত নির্ঘাত। ডালপালায় আটকে এবং গোঁত খেয়ে খেয়ে যখন নীচে এসে পড়লেন, তখন ঘাড় না-হোক হাড়পাঁজর কিছু-না-কিছু ভাঙারই কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভাঙা তো দূরের কথা, ব্যথাটুকুও টের পেলেন না তিনি।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে হঠাৎ বোঁটকা গন্ধটা পেলেন। আঁতকে উঠে দেখলেন—যা দেখলেন, তা প্রত্যয় হল না।

একটা বিশাল বাঘ। বাঘ যে এত বড়ো হয়, তা ধারণাতেই ছিল না তদানীন্তনের। লেজ থেকে মাথা অবধি বোধহয় হাত দশেক হবে। উঁচুও একটা বড়ো মোষের সমান। বাঘটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর একটা অদ্ভুত শব্দ করে গোঙানি ছাড়ছে।

এরকম অবস্থায় তদানীন্তন আর পড়েননি কখনো। শত্রুও যেন না-পড়ে।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ভরে বাঘটার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর কানে তাঁরই বিবেক যেন বলে উঠল, 'তুমি না চিকিৎসক! চিকিৎসক কী রুগি বাছে? জীব কষ্ট পাচ্ছে, তোমার কাজ তুমি করো।'

তদানীন্তনের ভিতরের সুপ্ত কবিরাজটি জেগে উঠল। তিনি যন্ত্রণাকাতর বাঘটার কাছে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তদানীন্তন একটু চেষ্টা করতেই বাঘটার সামনের ডান পায়ের থাবায় কিছু ওপরে নাড়িটাও টের পেলেন। বেশ চঞ্চল নাড়ি। বুঝতে পারলেন, বাঘটার পিত্ত কুপিত হয়েছে। বাঘটা হ্যাহ্যা করে হাঁফাচ্ছিল, আর জ্যোৎস্নাটাও নিশুতরাতে বেশ জোরালো হয়ে পড়েছে বলে জীব পরীক্ষা করতেও বেগ পেতে হল না। চোখ টেনে চোখের কোলটাও পরীক্ষা করে নিলেন।

জঙ্গলে গাছগাছড়ার অভাব নেই। মোক্ষম ওষুধটি খুঁজে বের করতে কষ্টও হল না। এনে খাইয়ে দিলেন। বাঘটাও, আশ্চর্যের বিষয়, খেল।

তারপর বাঘটা একটু আরাম বোধ করে শুয়ে পড়ল। তদানীন্তন তার পিঠ চুলকে দিলেন। কানে সুড়সুড়ি দিলেন। বাঘটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

বুঝতে পারলেন,বাঘটার পিত্ত কুপিত হয়েছে ।...

এরপর বাঘের দুধ জোগাড় করতে আর কষ্ট পেতে হয়নি তাঁকে।

লোকে দেখেছে, সন্ধেবেলা বাঘটা এসে তদানীন্তনের গোয়ালঘরে ঢুকত, আর তদানীন্তন বালতি নিয়ে গিয়ে সের-সের দুধ দুইয়ে নিতেন। লোকে বলে, সেই দুধ থেকে ছানা, দই, এমনকি ঘি অবধি তৈরি করতেন তদানীন্তন। নিজে তো খেতেনই, চড়া দামে বিক্রিও করতেন।

কিন্তু যে-কথাটা বলার জন্য এই এত কথা, তা হল নরহরিকে নিয়ে।

তদানীন্তনবাবু তো বাঘের দুধ ও আর-সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে বার্ধক্য ঠেকানোর ওষুধ তৈরি করলেন। তারপর গিয়ে হাজির হলেন নরহরির দরবারে।

নরহরি ওষুধের শিশিটা খুলে নাকের কাছে ধরে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এঃ, বিচ্ছিরি গন্ধ। এতে কাজ হবে তো হে কবরেজ? নইলে কিন্তু...'

কাজ হল কি না, তা ঠিক বোঝা গেল না।

তবে ক-দিন বাদে একদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা। তদানীন্তন তাঁর গাছগাছড়ার খোঁজে যাচ্ছিলেন। আর ঘোড়া দাপিয়ে প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নরহরি।

একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন।

'এই যে কবরেজ! কী খবর?'

তদানীন্তন তটস্থ হয়ে বললেন, 'যে আজ্ঞে। খবর ভালোই। তা আপনাকে বেশ ছোকরা-ছোকরা দেখাচ্ছে কিন্তু।'

এ-কথায় হঠাৎ ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলেন নরহরি। তারপর গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এ-কথাটা আজকাল আমাকে সবাই বলে কেন বলো তো! একী ইয়ার্কি নাকি?'

'আজ্ঞে না, ইয়ার্কি হবে কেন? যথার্থই বলে।'

নরহরি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি পেয়েছ। ছোকরা দেখালেই হল? বয়স কত হয়েছে তা খেয়াল আছে? একাত্তর ছাড়িয়ে বাহাত্তরে পড়লুম, আর ছোকরা দেখাবে মানে? বয়সের গাছপাথর নেই, তা জানো? ওসব কবরেজি একদম করবে না আমার কাছে। বুড়ো বয়সে বুড়ো হওয়াটাই ধর্ম, বুঝলে? ছোকরা দেখানোটা কাজের কথা নয়।'

'যে আজ্ঞে।'

'চুলে পাক ধরেছে, দেখেছ? কষের দাঁত পড়েছে জানো? আজকাল দশখানা পরোটার বেশি খেতে পারি না, খবর রাখো?'

'আজ্ঞে না।'

'খুব কবরেজ হয়েছ! পণ্ডিত ঠিকই বলে, কবিরাজ না কপিরাজ।' এই বলে ফের ঘোড়া ছোটালেন নরহরি। তদানীন্তন হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

নফরগঞ্জের রাস্তা

ও মশাই, নফরগঞ্জে যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে বলতে পারেন?

নফরগঞ্জে যাবেন বুঝি? তা আর বেশি কথা কী! গেলেই হয়। বেশি দূরের রাস্তাও নয়। নফরগঞ্জে একরকম পৌঁছে গেছেন বলেই ধরে নিন।

বাঁচালেন মশাই, স্টেশন থেকে এই রোদ্দুরে মাইল পাঁচেক ঠ্যাঙাচ্ছি। তিন-তিনটে গাঁ পেরিয়ে এলুম, এখনও নফরগঞ্জের টিকিটিও দেখতে পাইনি।

আহা, বড্ড হয়রান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে! এই দাওয়াতেই বসে জিরিয়ে নিন কিছুক্ষণ। বেলা মোটে বারোটা বাজে। চিন্তা নেই।

তা না-হয় বসছি। তা নফরগঞ্জ এখান থেকে কতটা দূর বলতে পারেন?

অত উতলা হচ্ছেন কেন? এই মানিকপুর গাঁ-কে তো অনেকে নফরগঞ্জের চৌকাঠ বলেই মনে করেন। তা নফরগঞ্জে কার বাড়িতে যাবেন মশাই?

সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। গলাটাও শুকিয়ে এসেছে কিনা। তা একটু জল পাওয়া যাবে?

বলেন কি! মানিকপুরে জল পাওয়া যাবে না মানে? মানিকপুরে জল যে অতিবিখ্যাত। এখানকার জলে কলেরা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ, আমাশয়, বেরিবেরি সব সারে। এই যে ঘটিভরা জল, ঢক ঢক করে মেরে দিয়ে দেখেন দিকি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শরীরের বল ফিরে আসে কিনা।

বাঁচালেন মশাই, তেষ্টায় বুকটা কাঠ হয়ে আছে।

কেমন বুঝলেন জল খেয়ে?

দিব্যি জল, হুবহু জলের মতোই।

জলের মতো লাগলেও ও আসলে হল জলের বাবা। একবার পেটে সেঁধোলে আর উপায় নেই। লোহা খেলে লোহাও হজম হয়ে যাবে। রোগ-বালাই পালাই পালাই করে পালাবে। হাতির বল এসে যাবে শরীরে।

তাই হবে বোধহয়। জল খেয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছে। এবার তাহলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই রওনা দিতে পারি।

আহা, সে হবে-খন। নফরগঞ্জ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তা কার বাড়ি যাবেন যেন?

কুঞ্জবিহারী দাস মশাইয়ের নাম শোনা আছে কি?

কুঞ্জবিহারী? তা কুঞ্জবিহারী কি আপনার কেউ হয়? শালা বা ভগ্নীপোত বা ভায়রাভাই গোছের?

না মশাই না, কুঞ্জবিহারীকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে।

তা ভালো, তবে কিনা ভেবে-চিন্তে যাওয়া আরও ভালো।

কেন মশাই, ভেবে-চিন্তে যাওয়ার কী আছে? মানুষের বাড়িতে কি মানুষ যায় না? তার ওপর মাথায় একটা দায়িত্ব নিয়েই যেতে হচ্ছে।

সেটা বুঝতে পারছি। প্রাণের দায় না-হলে কী কেউ সাধ করে নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারীর ডেরায় গিয়ে সেঁধোবার সাহস করে?

আপনি কি বলতে চাইছেন যে কুঞ্জবিহারী খুব একটা সুবিধের লোক নন!

সে-কথা আবার কখন বললুম? না মশাই, আমি বড্ড পেট-পাতলা মানুষ। মনের ভাব চেপে রাখতে পারিনে। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, ওসব ধরবেন না।

বলেই যখন ফেলেছেন তখন ঝেড়ে কেশে ফেললেই তো হয়। অসোয়াস্তি কমে যাবে।
আসলে কী জানেন কুঞ্জবিহারী বোধহয় খুবই ভালো লোক। তবে নিন্দুকেরা নানা কথা রটায় আর কী!
না মশাই, আপনি চেপে যাচ্ছেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে, আমার ভাইঝির সঙ্গে কুঞ্জবিহারীর ছেলে বিপ্লববিহারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতেই আসা।
বিপ্লববিহারী, ওরে বাবা!
অমন আঁতকে উঠলেন কেন মশাই! বিপ্লববিহারী কি ছেলে ভালো নয়? শুনেছি সে ভালো লেখাপড়া জানে। এম এস সি পাস করে আরও কী সব পড়াশুনো করেছে। চাকরিও করে ভালো।
তা হবে। কত কিছুই তো শোনা যায়।
না:, বড্ড মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। ভাবগতিক তো মোটেই ভালো বুঝছি না। দাদাকে বারবার বললুম, ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ অত দূরে কোরো না। কিন্তু দাদা কী আর শোনার পাত্র? বেশ ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি। ও মশাই, একটু খুলে বলুন না, এখানে বিয়ে হলে আমার ভাইঝিটা কি জলে পড়বে?

আপনি কি বলতে চাইছেন যে কুঞ্জবিহারী খুব একটা সুবিধের লোক নন !

ভাইঝি তো আপনার। তাকে জলে ফেলুন, ডাঙায় ফেলুন সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমি আর কথাটি কইছি না।
তাহলে আর কী করা! যাই, নিজের চোখে অবস্থাটা একটু দেখেই আসি।
আহা অত তাড়া কীসের? দুটো মিনিট বসেই যান। আমার মেয়েকে বলেছি, শশা দিয়ে দুটি মুড়ি মেখে দিতে। দুপুরবেলায় গেরস্থ বাড়িতে শুধু মুখে চলে গেলে যে অকল্যাণ হয়। ডাব পাড়তে গাছে লোক উঠেছে। এল বলে। ডাব খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন।
না মশাই, না! দুপুর গড়িয়ে গেলে চলবে না। সেখানে যে আমার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন!
দেরি কীসের। সবে তো বারোটা। পথও বেশি নয়। কথা আছে।
আজ্ঞে, কথাই তো শুনতে চাইছি।
নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারী দাস সম্পর্কে জানতে চাইলে এ তল্লাটের গাছপালা, গোরুবাছুরকে জিগ্যেস করলেও মেলা খবর পেয়ে যেতেন। এই দশ-বারো বছর আগেও কুঞ্জগুণ্ডা দিনে তিনটে খুন না-করে জলস্পর্শ করত না। প্রতি রাতে অন্তত গোটা দুই বাড়িতে ডাকাতি না-করলে তার ঘুম হত না। আর রাহাজানি, তোলা আদায় কোন গুণটা না-ছিল তার! তবে এখন বয়স হওয়াতে রোখ কিন্তু কমেছে। নিতান্ত দায়ে না-পড়লে আর বিশেষ লাশটাশ ফেলে না। তবে তার জায়গা এখন নিয়েছে ওই তার ছেলে বিপ্লববিহারী। তফাত হচ্ছে। বাপ মানুষ মারত দা-কুড়ুল দিয়ে, ছেলে মারে বন্দুক-পিস্তল দিয়ে।
বলেন কী মশাই! দাদা যে বলল, কুঞ্জবিহারী রীতিমতো ফোঁটাকাটা বৈষ্ণব। ভারি নিরীহ মানুষ। তার ছেলেটিও নাকি ভারি বিনয়ী। আর খুবই সভ্যভব্য।

হাসালেন মশাই, আপনার দাদার চোখে নিশ্চয়ই চালসে ধরেছে। এই যে আপনার মুড়ি আর ডাব এসে গেছে। রোদে তেতে-পুড়ে এসেছেন, একটু খিদে-তেষ্টা মিটিয়ে নেন তো?

আর খিদে-তেষ্টা। আপনার কথা শুনে খিদে-তেষ্টা তো মাথায় উঠেছে।

আহা, তা বললে কী আর চলে? তা ভাইজির বিয়ে দেওয়ার জন্য কি আর পাত্র জুটল না?

সেইটেই তো ভাবছি। দাদার তো দেখছি কান্ডজ্ঞানই নেই।

তা কুঞ্জগুণ্ডা তার ছেলের বিয়েতে কত পণ নিচ্ছে? দু-চার লাখ টাকা হবে না?

না মশাই, সেরকম তো কিছু শুনিনি। বরং দাদা একবার কথা তোলায় নাকি কুঞ্জবিহারী তার দু-হাত ধরে কেঁদে ফেলে আর কী! লোকটা নাকি বলেছে, তাদের বংশেই পণ নেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই।

হুঁ:! আপনিও বিশ্বাস করলেন সে কথা। আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে না-নিলেও গোপনে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে ঠিকই। ধরে রাখুন, তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা হবেই।

কিন্তু দানসামগ্রী দিতেও যে বারণ করেছে। বলেছে, দানসামগ্রী আবার কীসের? আমার ছেলে যদি তার বউকে প্রয়োজনের জিনিস কিনে দিতে না-পারে তবে আর তাকে যোগ্যপাত্র বলে ধরা যায় না।

হে: হে:, কথার মারপ্যাঁচ মশাই, কথার মারপ্যাঁচ। এখন ওসব বললে কী হয়। বিয়ের পর দেখবেন নানা ছুতোয় হরেক রকম ফিকির করে ঘাড়ে ধরে আদায় করবে।

আপনি তো আমাকে বড়োই টেনশনে ফেলে দিলেন মশাই। এখন এই বিয়ে কী করে ভাঙা যায় তাই ভাবছি। কথা একরকম পাকা হয়েই আছে। আজ দিন ঠিক করে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার। পুরুতমশাই অপেক্ষা করছেন। বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

বিয়ে ভেঙে দেওয়াই ঠিক করে ফেললেন বুঝি!

তা ছাড়া আর উপায় কী বলুন।

আহা, শুনে বড়ো স্বস্তি পাচ্ছি। মেয়েটা বেঁচে গেল। তাহলে বরং আজ আর আপনার নফরগঞ্জে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ির পিছনে টলটলে পুকুরের জলে স্নান করে নিন, তেল গামছা সাবান সব আসছে ভিতরবাড়ি থেকে। তারপর দুপুরে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হবেন-খন। পাবদামাছের ঝাল, সরপুঁটির সরষে ভাপা, রুইমাছের কালিয়া, ঝিঙে পোস্ত, সোনা মুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, চাটনি আর পায়েস হয়েছে। এতে হয়তো আপনার একটু কষ্টই হবে। তবু গরিবের বাড়িতে দুটি অন্নগ্রহণ না-করলে ছাড়ছি না মশাই।

বাপ রে! বলেন কী? এত দূর এসে যদি ফিরে যাই তাহলে দাদা কী আর আমাকে আস্ত রাখবে। বিয়ে ভাঙতে হলে কুঞ্জবাবুর মুখের ওপরেই কথাটা কয়ে আসতে হবে। তাতে প্রাণ গেলেও কিছু নয়। আর ভোজ খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও আমার নয়। আমাকে এখনই রওনা হতে হচ্ছে।

বলছিলাম কী, উত্তেজিত না-হয়ে আর একটু বসুন। বলছিলাম কী, বিয়েটা একেবারে ভেঙে দেওয়ার আগে একটু অগ্রপশ্চাত ভাবাও তো দরকার। হুট বলে বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাও ঠিক হবে না।

বলেন কী মশাই। এরপরও এই বিয়ে কেউ দেয়?

সেটা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা কুঞ্জবিহারী বা বিপ্লববিহারীর বদনাম থাকলেও তাদের সংসারে কিন্তু অশান্তি নেই। কুঞ্জগুণ্ডার বউ কুসুম তো ভারি লক্ষ্মীমন্ত মহিলা। পুজোপাঠ, ব্রাহ্মণসেবা, দানধ্যান, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মেলা গুণ রয়েছে।

অ্যাঁ। এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘ।

যে আজ্ঞে! বিয়ে হলে আপনার ভাইজি দুঃখে থাকবে না। কারণ, বিপ্লববিহারী বাইরে যেমনই হোক, আসলে ছেলে তেমন খারাপ নয়। ষন্ডা হলেও সে ফিজিক্সে এম এস সি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তার ওপর এম বিএ। স্বভাবও ভারি ভালো। ভারি বিনয়ী, ভারি ভদ্রলোক।

এ যে উলটো গাইছেন মশাই।

আহা যার যা গুণ তা তো বলতেই হবে। আর কুঞ্জবিহারীও ষন্ডাগুণ্ডা বটে, কিন্তু বৈষ্ণবও বটে। রোজ গেঁড়িমাটি দিয়ে রসকলি কাটে। ভিখিরিদের খাওয়ায়, জীবসেবা করে। গুণ কিছু কম নেই।
এ তো ফের উলটো চাপ মশাই।
উলটো চাপ নয় মশাই, মানুষের দোষের কথা শুধু বললেই তো হবে না। তার গুণের দিকটাও তো দেখা দরকার।
কুঞ্জগুণ্ডার আরও গুণ আছে নাকি?
তা আর নেই। জীবনে কখনো এক পয়সা কাউকে ঠকায়নি। একটি কালো টাকাও তার তবিলে নেই। গরিবদুঃখীর জন্য প্রাণ দিয়ে করেন। গাঁয়ে চারখানা পুকুর কাটিয়েছেন, অনাথ আশ্রম খুলেছেন, স্বর্গত বাপের নামে অন্নসত্র দিয়েছেন, দুটো ইস্কুল তাঁর পয়সায় চলে। দানধ্যানের লেখাজোখা নেই মশাই।
তাহলে যে বলছিলেন লোক খুব খারাপ। খুন-টুন করেন।
আজ্ঞে তাও করে থাকতে পারেন। তবে কিনা খুনগুলো প্রমাণ হয়নি। অন্তত পুলিশের কাছে কোথাও রেকর্ড নেই। কেউ কেউ বলে আর কী।
না মশাই, আমার মাথা ঘুরছে। এবার রওনা না-হলেই নয়।
আহা ব্যস্ত হবেন না। কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। স্বয়ং কুঞ্জবিহারীই এসে ভিতর বাড়িতে বসে আছেন।
এসব কী বলছেন! কুঞ্জবিহারী এখানে এসে বসে আছেন, এর মানে কী?
আজ্ঞে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।
কীরকম?
এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর নয়।
তাহলে?
আপনি আতাগঞ্জ পেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে ফেলায় একটু ঘুরপথে ঝালাপুর হয়ে সোজা নফরগঞ্জেই এসে পড়েছেন যে! সোজা মানিকপুর হয়ে এলে রাস্তা দু-মাইল কম পড়ত।
তাহলে এবাড়ি—?
আজ্ঞে এটাই কুঞ্জবিহারী দাসের বাড়ি। আমি হলুম গে তাঁর ভায়রাভাই নবকুমার হাজরা।
অ। তাই বলুন।

কবচ

আরে হরিপদবাবু যে! প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম! প্রাতঃপ্রণাম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না মশাই?
তার তাড়াহুড়ো নেই, ক্রমে ক্রমে চিনবেন। আগে কুশলপ্রশ্নাদি সেরে নিই, তারপর তো অন্য কথা। তা বলি আপনার খিদে-টিদে ঠিকমতো হচ্ছে তো? রাতে বেশ সুনিদ্রা হয় তো? কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে তো?
দেখছেন তো মশাই, বাজার যাচ্ছি। এখন কী আর এত খতেনের জবাব দেওয়ার সময় আছে?
কিন্তু হরিপদবাবু, প্রশ্নগুলোকে তুচ্ছ ভাববেন না। এসব প্রশ্নের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্যও থাকতে পারে তো। এই যে ধরুন, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাতে ভালো ঘুমোননি, নানারকম দুশ্চিন্তা করেছেন। আপনার তেমন খিদেও হচ্ছে না বলে মুখখানা আঁশটে করে রেখেছেন। কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না বলে আপনার মেজাজটাও বেশ তিরিক্ষি। ঠিক কি না!
তা খুব একটা ভুলও বলেননি বটে। আপনার মতলবখানা কী বলুন তো?
চলুন, বাজারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতেই দুটো কথা কয়ে নিই।
কথা কওয়ার উদ্দেশ্যটা কি একটু বলবেন? খামোখা একজন উটকো লোকের সঙ্গে হাপরহাটি বকে মরার সময় আমার নেই।
আহা, চটে যাচ্ছেন কেন? ষষ্ঠীচরণ যে আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পায় আর সুদসমেত সেই পাঁচ হাজার যে পঞ্চাশ হাজার দাঁড়িয়ে যেতে বসেছে, আর পচা গুণ্ডা যে ষষ্ঠীচরণের হয়ে আপনার গলায় গামছা দিয়ে প্রতি মাসে অন্যায্য টাকা আদায় করছে, সে তো আর আমার অজানা নয়।
দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। এসব গুহ্য কথা আপনি জানলেন কী করে? মেয়ের বিয়ের সময় মোটে পাঁচটি হাজার টাকা ষষ্ঠীচরণের কাছে ধার নিয়েছিলুম। তখন কী আর জানতুম যে, ওই পাঁচ হাজারের ফেরে আমার ঘটিবাটি চাঁটি হওয়ার জোগাড় হবে! ঠিকই বলেছেন মশাই, আমার খিদে হচ্ছে না, ঘুম উধাও, কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার লক্ষণই নেই।
শুধু কী তাই হরিপদবাবু? গণকঠাকুর সদানন্দ সরখেল যে শনির দৃষ্টি কাটানোর জন্য প্রায় জবরদস্তি একখানা নীলা ধারণ করিয়েছিলেন তারও কিস্তি টানতে গিয়ে আপনি কী কম নাকাল হচ্ছেন। সদানন্দ আবার ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, কিস্তি ঠিকঠাক না-দিলে মহাক্ষতির অভিশাপ লাগবে। তার ওপর ধরুন আপনার বাড়ির পাশেই মহাকালী ব্যায়ামাগারের আখড়া। তারা জোর করে আপনার জমির আড়াই ফুট বাই ষাট ফুট দখল করে বসে আছে, আর আপনি প্রতিবাদ করলেই তেড়ে আসছে, এও তো সবাই জানে কিনা।
আশ্চর্য মশাই, আমি আপনাকে না-চিনলেও আপনি তো দেখছি আমার সব খবরই রাখেন! তা মশাই, এত সব জানলেন কী করে? আপনি কি শত্রুপক্ষের লোক?
ছি:-ছি:, হরিপদবাবু এরকম অন্যায় সন্দেহ আপনার হল কী করে? আপনার ভালো চাই বলেই না আর পাঁচটা গুরুতর কাজ ফেলে আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি! আপনার গিন্নির বাঁ-হাঁটুর বাত আর অম্বলের অসুখের জন্য ডাক্তার-বদ্যি আর ওষুধের পিছনে আপনার যে হাজার-হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে সে-খবর জানি বলেই না আপনার দুঃখে দুঃখিত হয়ে না-এসে থাকতে পারলাম না।
কিছু মনে করবেন না মশাই, আজকাল লোক চেনা খুব শক্ত বলে একটু ধন্দ ছিল। এখন বুঝতে পারছি, আপনি তেমন খারাপ লোক নন।

নই-ই তো! এই যে গেল হপ্তায় আপনি অফিসের লেজারে একটা চল্লিশ হাজার টাকার ক্রেডিট এন্ট্রি ভুল করে ডেবিটের ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য গণেশবাবু কী অপমানটাই না আপনাকে করলেন। ইডিয়ট, গুড ফর নাথিং, অপদার্থ, মিসফিট, নন-কমিটেড ইত্যাদি কী বলতে বাকি রাখলেন বলুন। তার ওপর হেডঅফিসে জানিয়ে আপনাকে পায়রাডাঙায় বদলি করার হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। আর আপনি ভালোই জানেন, পায়রাডাঙায় বদলি হওয়া মানে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
ওঃ মশাই, আপনি নির্ঘাত অন্তর্যামী। এত খবর রাখেন দেখে আমি কেবল অবাকের পর অবাক হচ্ছি। সত্যিই মশাই, গণেশবাবুর মতো এমন অকৃতজ্ঞ লোক হয় না। এই তো গত ইয়ার এণ্ডিং-এ গণেশবাবুর মান বাঁচাতে পরপর চারদিন অফিসের সময় পার করেও দু-তিন ঘণ্টা করে বেশি খেটে তাঁর কাজ তুলে দিয়েছি। এই কী তার প্রতিদান? আর ভুলটাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। সেদিন জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্নে যাব বলে একটু তাড়াহুড়ো ছিল। বিকেল ছ-টা ছাব্বিশের ট্রেন ধরব বলে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সামান্য একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল।
সেই কথাই তো বলছি। তারপর ধরুন, এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড়ে কী কান্ডটা হল?
কিছু হয়েছিল নাকি? কী হয়েছিল বলুন তো?
সে কী মশাই, এত বড়ো ঘটনাটা ভুলে মেরে দিলেন! আপনার তো এখনও ভীমরতি ধরার বয়স হয়নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর তিন মাস, এর মধ্যেই স্মৃতিবিভ্রম তো ভালো কথা নয়। অবশ্য জলাতঙ্কের ইনজেকশন নিলে অনেক সময়ে শরীরে নানারকম কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়, তাতে স্মৃতিবিভ্রম হওয়াও বিচিত্র নয়।
আমি যে জলাতঙ্কের ইনজেকশন নিয়েছিলাম এ খবরও আপনি জানেন দেখছি। না:, আমার আরও অবাক হওয়ার উপায় নেই মশাই। ইতিমধ্যে অবাক হওয়ার অপটিমামে পৌঁছে গেছি।
আহা, অবাক হওয়ার দরকারটাই বা কী আপনার! এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড় দিয়ে আসার সময় আপনি যে দূরে শ্যামাদাস মিত্তিরকে দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে 'শ্যামাদাস, ওহে শ্যামাদাস' বলে চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিলেন, তা কি আপনার মনে নেই?
দোষটা কিন্তু শ্যামাদাসেরই, বুঝলেন মশাই, গত অক্টোবরে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বলে আমার কাছে দূরবিনটা ধার চেয়েছিল। দূরবিনটা আমার ঠাকুরদার। সাবেক জিনিস, একটা স্মৃতিচিহ্নও বটে। কিন্তু শ্যামাদাস এমন বেআক্কেলে যে, দূরবিনটা ছ-মাসের মধ্যে ফেরত দিল না। চাইলেই বলে, দেব দিচ্ছি। তারপর শুনলুম তার বড়ো শালা নাকি দূরবিনটা তার কাছে চেয়ে নিয়ে গেছে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবে বলে। বলুন তো, টেনশন হওয়ার কথা নয়। তাই সেদিন তাকে দেখে ওরকম ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলুম।
আর তার ফলেই না আপনি রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে ফেললেন। আর কুকুরটাও ঘ্যাক করে আপনার ডান পায়ে কামড় বসিয়ে দিল।
ওঃ, সে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনাই বটে। তবে আপনি যে অন্তর্যামী সে বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহই নেই। এসব ঘটনা আমার বাড়ির লোক আর অফিসের কলিগরা ছাড়া কেউ জানে না। কুকুরের কামড়ের চেয়েও অনেক বেশি যন্ত্রণা হল পেটে অতগুলো ইনজেকশন নেওয়া। সে কী অসহ্য অবস্থা তা কহতব্য নয়।
না হরিপদবাবু, আপনি নবুবাবুর কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার দুর্ভোগের জন্য নবুবাবুর অবদানের কথাটাও একটু ভাবুন। সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় নবুবাবুর ছেলে গজা অঙ্কে বাইশ পেয়েছিল। নবুবাবু তখন আপনাকে গজার প্রাইভেট টিউটার রাখেন। অঙ্কের মাস্টার হিসেবে আপনার খুবই সুনাম। গজাকে অঙ্ক শেখানোর জন্য আপনাকে নবুবাবু মাসে সাতশো টাকা দিতেন। তা দেবেন নাই বা কেন। নবুবাবুর টাকার লেখাজোখা নেই, আর গজাও তার একমাত্র ছেলে। কিন্তু হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে এগারো পেল এবং অ্যানুয়েলে পেয়েছিল মাত্র তিন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নবুবাবু আপনাকে ছাড়িয়ে তো দিলেনই, তার ওপর

প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করলেন। অভিযোগ ছিল, আপনি ইচ্ছে করেই গজাকে ভুলভাল শিখিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর গোয়ালে আগুন লাগানোর অভিযোগে এক দফা, তাঁর বুড়িপিসির মৃত্যু হওয়ায় সেটাকে খুনের মামলা সাজিয়ে আর এক দফা, তাঁর বাড়িতে যে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল সেই বাবদে তিনি আর এক দফা আপনাকে অভিযুক্ত করে এফ আই আর করেন। পুলিশ একবার আপনাকে নিয়ে গিয়ে থানার লকআপে এক রাত্রি আটকেও রাখে। ঠিক কি না?

আর বলবেন না মশাই, আমার দোষ কী বলুন! গজা বেশিরভাগ দিনই অঙ্ক কষতে বসে ঘুমিয়ে পড়ত বা পেট ব্যথা বলে আমাকে বিদায় করে দিত। নবুবাবুকে বলেও লাভ হত না। বলতেন ছেলেমানুষ, ওরকম তো একটু করবেই। ওই ফাঁকে ফাঁকে শিখিয়ে দেবেন। কী কুক্ষণে যে গজাকে পড়াতে রাজি হয়েছিলুম কে জানে। নবুবাবু আমার জীবনটাই অসহ্য করে তুলেছেন।

সম্প্রতি তিনি আপনার বিরুদ্ধে একটা জালিয়াতির মামলা করার জন্যও তৈরি হচ্ছেন বলে শুনেছি।

ওরে বাবা!

তাই তো বলছি, আপনি কেমন আছেন সেটা জানা বড়ো দরকার।

যে আজ্ঞে। ভেবে চিন্তে মনে হচ্ছে আমি বিশেষ ভালো নেই। আমার ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না। বুক দুরদুর করে, শরীর দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে।

আহা, তার জন্য চিন্তা কী হরিপদবাবু। আমি তো আছি।

আপনি আছেন, কিন্তু কীভাবে আছেন?

আপনার দুঃখদুর্দশা দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল বলেই তো হিমালয়ে পাহাড়িবাবার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম।

বলেন কী? আমার জন্যে আপনি হিমালয় ধাওয়া করেছিলেন? আপনি তো অতিমহৎ মানুষ মশাই। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিও না!

তাতে কী? আমার চেনা-অচেনা ভেদ নেই। আপনার দুঃখের কথা পাহাড়িবাবার শ্রীচরণে নিবেদন করতেই উনি টানা পাঁচ বছরের ধ্যানসমাধি থেকে জেগে উঠে খুব চিন্তিত মুখে বললেন, তাই তো? হরিপদর সময়টা তো বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। এর একটা বিহিত তো করতেই হয়।

বলেন কী মশাই?

তবে আর বলছি কী! পাহাড়িবাবার মহিমা তো জানেন না। সাক্ষাৎ শিবস্বয়ম্ভো! তিনি প্রসন্ন হলে আর চিন্তা কীসের? তা তিনি সব শুনেটুনে আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েই এই একস্ট্রা স্পেশাল বগলামুখী কবচখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা দুধ, দই আর গঙ্গাজলে শোধন করে ধারণ করবেন। দেখবেন সব গ্রহ-বৈকল্য কেটে গিয়ে আপনি একেবারে অন্য মানুষ।

...আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েই এই একস্ট্রা স্পেশাল বগলামুখী কবচখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন...

আপনি তো বড়ো পরোপকারী মানুষ মশাই।
আর লজ্জা দেবেন না। মানুষের জন্য আর কতটুকুই বা করতে পারি। যাই হোক, প্রণামী বাবদ সামান্য পাঁচ হাজার টাকা ফেলে দিলেই হবে।
অ্যাঁ!
আজ্ঞে হ্যাঁ।